আর্ট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার একবিংশ গ্রন্থ

মধুপর্ক

শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায়

কার্ত্তিক, ১৩২৪

PUBLISHED BY
GURUDAS CHATTERJEA
OF MESSRS. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, Cornwallis street, Calcutta.

PRINTED BY
RADHASYAMI DAS
AT THE VICTORIA PRESS
2, Goabagan Street, Calcutta.

SARASWAT LIBRARY
Estd.-1919
MAKARDAH-HOWRAH.

মধুপর্ক

উন্মাদ

আমাকে উঠিতে দেখিয়া শচীশ বলিল, "সে কি ? এরি মধ্যে ! এলে যখন, গারদটা দেখেই যাও একবার !"

আমি বলিলাম, "সে কথা মন্দ নয়,—চল।"

শচীশ আমার বাল্যবন্ধু। এখন পাগ্‌লা গারদের ডাক্তার। কার্য্যগতিকে এ অঞ্চলে আসিয়া পড়াতে অনেকদিন পরে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ।

কত রকমের পাগলই যে দেখিলাম ! কেহ 'শিবনেত্র' হইয়া 'ব্যোম্-ভোলানাথে'র মতই ধ্যানাসনে বসিয়া আছে, কেহ হাসিতেছে কাঁদিতেছে, কেহ নাচিতেছে গায়িতেছে, কেহ বা চেঁচাইয়া আকাশ ফাটাইতেছে ! একজন আমাকে গম্ভীরভাবে কাছে ডাকিয়া চুপিচুপি কাণে কাণে বলিল, "আপনি যদি কারুকে কিছু না বলেন, তাহলে একটি ভাল খবর দিতে পারি ;"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা, কারুকে বল্‌ব না—বলুন।"

পাগল বলিল, "আপনি কি রাতারাতি নবাব হতে চান?"

—"খুব চাই!"

—"শুনুন তবে। দেখ্‌বেন—কারুকে বল্‌বেন না কিন্তু! আমি যখের ধনের সন্ধান পেয়েছি। সাতঘড়া মোহর—এক বাক্স হীরে-জহরৎ! কোথায় আছে, আপনাকে বলে দেব।"

আমি বলিলাম—"বলুন।"

সে বলিল—"একি ফস্‌ করে বলে ফেলবার কথা! আসুন, আগে একটু বসুন—বিশ্রাম করুন—তারপর ধীরে-সুস্থে একে একে সব বলচি!"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আচ্ছা, পরে আর একদিন এসে সব শোনা যাবে। আজ আর সময় নেই।"

আর এক জায়গায় দেখিলাম, একটি লোক একখানা কাঁচ লইয়া জলে ডুবাইতেছে, শানে ঘষিতেছে আর মাঝে মাঝে কাচখানা একচোখ বুজিয়া দেখিতেছে।

আমি তাকে অনেক ডাকিলাম, সে কিন্তু একবার মুখও তুলিল না—আমার কথার উত্তরে একটি টুঁ শব্দও করিল না।

শচীশ বুঝাইয়া দিল, "এঁর বিশ্বাস, ইনি শীঘ্রই বিজ্ঞান-

রাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত করবেন। ওঁর ব্রত, ঐ কাঁচখানাকে মেজেঘষে একেবারে খাঁটি হীরে করে ফেলা। যতদিন এ মহৎ ব্রত-উদ্‌যাপন না হয়, এঁর দৃঢ়পণ, ততদিন ইনি মৌনী থাকবেন।”

আর একজন আমাকে ডাকিয়া বড়ই দুঃখিতভাবে নালিশ জানাইল, “মশাই, এরা ‘জিনিয়াসে’র ওপরে কি রকম যাচ্ছেতাই জবরদস্তি করে, জানেন?”

আমি বলিলাম, “কি-রকম?”

সে তার মাথাটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখাইয়া বলিল, “দেখুন, মশাই দেখুন! এরা আমার মাথার চুল খাটো করে ছেঁটে দেয়, আমার মানা মানে না। মাথায় বাব্‌রি-কাটা চুলই যদি না রহিল, লোকে আমাকে তবে কবি বলে চিন্‌বে কিসে, বলুন ত?”

আমি হাসি চাপিয়া বলিলাম, “তা যা বলেছেন!”

পাগল খুসী হইয়া বলিল, “আপনাকে রসিক বলে আমার সন্দেহ হচ্ছে। আরো শুনুন, আমি কাগজ কলম চাইলে এরা তা কিছুতেই দেয় না, উল্টে দাঁত বার করে হাসে। হায়, হায়, কাগজ-কলমই যদি না রইল, কবি তবে কেমন করে কবিতা লিখ্‌বে—কেমন করে দুঃখিনী বঙ্গভাষার মুখোজ্জ্বল করবে? এরা ভাবে আমি বুঝি পাগল—”

তার কথা শেষ হইতে না হইতেই আমি সরিয়া পড়িলাম।

পাগল কবি আমাকে ডাক্ দিয়া বলিল, “আ আমার কপাল! আপনিও ঐ দলে? মশাই, যাবেন না—যাবেন না! পাগলের সঙ্গে ‘জিনিয়াসে’র কতকটা যে সম্পর্ক, আগে সেটা প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করে প্রাণ জল করে দি আসুন।”

শচীশ বলিল, “ইনি ভাবেন, কবিতা লিখ্‌লেই ডাল-ছেঁড়া পাকা আমের মত ‘নোবেল-প্রাইজ, এঁর হস্তগত হবে। এঁর মনে দৃঢ় ধারণা, পাছে ইনি ‘নোবেল-প্রাইজ’ পেয়ে যান, সেই হিংসায় রবি-ঠাকুরই ষড়যন্ত্র করে এঁকে এখানে নির্ব্বাসিত করে রেখেছেন!”

বাস্তবিকই,—এ এক নতুন দুনিয়া, এখানে সমস্তই আজব ব্যাপার! সকলেই এখানে সুখী—কেননা, এদের বিশ্বে বাস্তব বলিয়া কোন-কিছু নাই। আপনাদের বাসনাকে এঁরা ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া গড়িতেছে—যুক্তি, কারণ ও সহজজ্ঞানের কোন ধার ধারে না বলিয়া ‘অসম্ভব’ কথাটি এদের অভিধান হইতে মুছিয়া গিয়াছে!

সামনেই একটি ঘর। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, ঘরে কেউ নাই; কিন্তু তার পরেই দেখিলাম, এককোণে আধা-অন্ধকারে আবছায়ার মত একটি মূর্ত্তি, একেবারে যেন দেয়ালের সঙ্গে

মিশিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া আছে। বিশীর্ণ তার দেহ—বিষণ্ণ তার মুখ!

আমাদের পায়ের শব্দে চমকিয়া, সে মুখ তুলিয়া চাহিল। শচীশকে দেখিয়া, তার কোটরগত অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষুদুটী একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আস্তে-আস্তে বলিল, "কে, ডাক্তার?"

সে স্বর কি মানুষের? এমন অমানুষিক স্বর আমি জীবনে আর কখনো শুনি নাই!

শচীশ বলিল, "এখন কেমন আছেন?"

একটু ম্লান হাসি হাসিয়া, সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পর পা-দুটো যেন কোনমতে টানিয়া টানিয়া আমাদের কাছে আসিয়া, শচীশের দিকে অস্থিচর্ম্মসার একখানা হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "দেখুন।"

এতক্ষণে ভাল করিয়া লোকটার চেহারা দেখিয়া আমার গা শিহরিয়া উঠিল। হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, যেন শ্মশানের মড়াকে তুলিয়া আনিয়া ভুতুড়ে বিদ্যায় কে তাহাকে জীয়ন্ত করিয়া চলাইতেছে, ফিরাইতেছে! ওঃ, আর তার সেই বুকের ও কণ্ঠার হাড়গুলা! সেগুলার উপরে যেন মাংসের লেশমাত্র নাই—প্রতি নিশ্বাসেই ভয় হয়, উপরকার পাত্‌লা চামড়ার ঢাক্‌নি ফুঁড়িয়া এই মুহূর্ত্তেই তাহারা বুঝি বাহির

হইয়া পড়িবে! আমি স্তম্ভিতনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া কাঠ্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

শচীশ তাহার হাত ধরিয়া যতক্ষণ তার নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিল, ততক্ষণ সে উদ্বেগে ও আগ্রহে বিস্ফারিত-চক্ষে শচীশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শচীশ বলিল, "আপনার নাড়ীতে এখনো জ্বর আছে।"

কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইয়া সে বলিল, "বুকটা দেখ ত ডাক্তার!"

শচীশ তাহার বুকটা খানিকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বলিল, আপনার যক্ষ্মারোগ হয়েছে।"

রোগী একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া, আপন মনে মৃদুস্বরে বলিল, "আঃ! বাঁচলুম!" তারপর সে আবার ঘরের কোণে গিয়া বসিয়া পড়িল।

বাহিরে আসিয়া শচীশকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ভয়ানক! এ কে শচীশ?"

শচীশ বলিল, "আশ্চর্য্য পাগল! বছরের আর ক-মাস এ-লোকটি সহজ মানুষের মত থাকে; কিন্তু যতই বর্ষা ঘনিয়ে আসে, এর পাগলামিও তত বিষম হয়ে ওঠে। তখন ওর কাছে ঘেঁষে, কার সাধ্য!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "যক্ষ্মারোগ হয়েছে শুনে লোকটা অমন খুসী হয়ে উঠ্‌ল যে?"

শচীশ হাসিয়া বলিল, "যক্ষ্মা-টক্ষ্মা ওর কিচ্ছু হয় নি। ও আমার মিছে কথা।"

—"সেকি-হে?"

—"হ্যাঁ; আমি যদি বলতুম, 'আপনি ভাল আছেন'—তাহলে ও রসাতল কাণ্ড বাধিয়ে দিত। তারপর খাওয়া দাওয়া ছেড়ে হয়ত উপোস করেই মরে যেত। প্রথম যখন এখানে ডাক্তার হয়ে আসি, তখন ওর হাল-চাল জানা না থাকাতে ভারি মুস্কিলেই পড়া গিয়েছিল।"

আমি বিস্মিত স্বরে বলিলাম, "এ-রকম পাগলের কথা কখনো শুনি-নি।"

শচীশ বলিল, "ভদ্রবংশে লোকটির জন্ম, বেশ ভাল লেখা-পড়াও জানে। ওর জীবনের কথাও অদ্ভুত। গেল-বছরে ওর পাগলামি যখন বেড়ে ওঠেনি, আমি তখন কৌতূহলী হয়ে একদিন ওর পরিচয় জিজ্ঞাসা করি। সে-দিন সে কিছু বল্‌লে না বটে, কিন্তু দিনকতক পরে ওর হাতে-লেখা মস্ত এক চিঠি পেলুম। তাতে ওর নিজের কথা সব খুলে লেখা ছিল।"

আমি আগ্রহের সহিত বলিলাম, "সে চিঠি তুমি ছিঁড়ে ফেল-নি?"

—"না, সে ছিঁড়ে ফেল্‌বার চিঠি নয়। সত্যিমিথ্যে জানিনা, কিন্তু সেই কাগজ-ক-খানায় যা লেখা আছে, তা অতি ভয়ানক ব্যাপার। হয়ত তাতে পাগলের প্রলাপও কিছু কিছু আছে। কারণ আমার বিশ্বাস যে, চিঠিতে ও-লোকটি যে সব ঘটনার কথা বলেছে, সে ঘটনাগুলি ঘট্‌বার আগেই ওর মাথায় পাগ্‌লামির ছিট্‌ ঢুকেছিল। তুমি বোধ হয় জান লোকে যখন প্রথম পাগল হয়, তখন কোন একটা বিশেষ বিষয়ে তার অস্বাভাবিক ঝোঁক্‌ পড়ে। সে অবস্থায় প্রথম প্রথম সে কার্য্যকারণের জ্ঞান হারায় না। কিন্তু, তারপর সেই ঝোঁক্‌টা ক্রমে যতই বেশী হয়ে উঠ্‌তে থাকে, উন্মাদ-রোগ ততই তার ঘাড়ে চেপে বসে। হয়ত এ লোকটিরও সেই দশা হয়েছিল—চিঠি পড়্‌লে তুমিও তা বুঝ্‌তে পার্‌বে। তুমি কি সে চিঠি পড়্‌তে চাও? বিশ্বাস কর না কর, সে পড়্‌বার মত চিঠি বটে!

আমি বলিলাম, "পড়্‌ব বৈকি!"

* * * *

শচীশের বৈঠকখানায় পাগলের পত্র লইয়া ইজিচেয়ারে শুইয়া পড়িলাম। চিঠিতে যা লেখা ছিল, তা এই :—

"ডাক্তার,

আমি যে পাগল, আমার এই পরিচয়ই কি যথেষ্ট নয়?—

পাগলের কথায় কে বিশ্বাস করবে? তোমার গারদে কত লোক আছে, তাদের কেউ মনে করে 'আমি সম্রাট্', কেউ মনে করে 'আমি কবি', কেউ মনে করে 'আমি দেবতা',—কিন্তু তোমরা জান, তারা স্বধু পাগল,—খেয়ালের স্বপনে মস্গুল হয়ে আছে। তোমরা সে সম্রাট্দের হাত থেকে রাজদণ্ড কেড়ে নিয়েছ, কবিদের বাণীর কমলকানন থেকে নির্ব্বাসিত করেছ, দেবতাদের ফুল-চাল-কলা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছ। তাদের মুখের কথাকে তোমরা সম্রাটের হুকুম বা কাব্যের শ্লোক বা দেবতার অভিশাপ বলে ভ্রম কর না। তাদের কথা তোমরা তুড়ি মেরে স্রেফ্ উড়িয়ে দাও—আমার কথাতেই বা তোমাদের বিশ্বাস হবে কেন? তবু আমার কথা কেন যে তুমি জান্তে চেয়েছ তাই ভেবে আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি।

কিন্তু, জানতে যখন চেয়েছ, আমি যতটা পারি সব খুলে লিখ্ব। মনের কথা মনে চেপে রাখায় বড় কষ্ট। পাগলরা তা পারে না বলেই তারা এত দিল-খোলা হয়। আমি এখনো পাগলের সব গুণে গুণী নই,—মনের কথা তাই মনেই চেপে রাখতে পারি। কিন্তু এ কথা চাপবার চাপ মনকে আমার জাঁতাকলের মত পিষে ফেল্ছে—এতদিন তাই যা পারি-নি, আজ তা কর্ব। সব তোমাকে বল্ব। বিশ্বাস কর

ভালই,—না-কর পাগলামি বলে উড়িয়ে দিও। আমি সুধু বলে খালাস হতে চাই।

আর এক কথা। আমি পাগলা গারদে আছি বটে, কিন্তু এখন ঠিক পাগল নই। তুমি ত জান, বর্ষাকালটায় উন্মাদ-রোগ এসে আমার ঘাড়ে চেপে বসে। কিন্তু অন্যসময়ে আমি আর পাগলামির স্বপ্ন দেখি না। এ-সময়টায় মনে হয়, আমি যেন সবে ঘুম থেকে জেগে উঠেছি; কেন মনে হয় জানিনা,—কিন্তু, মনে হয়। সবে ঘুম ভাঙ্গলে মানুষের দেহ যেমন একটা অলস জড়তায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, আমিও তেমনি আচ্ছন্ন হয়ে থাকি। পাগলামি না থাকলেও আমি যে এই সময়টাতে একেবারে সহজ মানুষ হয়ে উঠতে পারি না, তার মূলে, ঐ জড়তা! এ-সময়টায় আমি ভাবতে পারি, সে ভাবনায় একটা কার্য্য-কারণের ধারা পাই—যে ধারা পাগলের চিন্তায় থাকে না। এইতেই বুঝি, এখন আমি পাগল নই।

ছেলেবেলাতেই বাপ-মা আমার মারা যান,—আমি মানুষ হয়েছি মামার-বাড়ীতে। শুনেছি বাবা মরবার আগেই পাগল হয়েছিলেন। আমার অতি-বৃদ্ধ পিতামহও পাগল ছিলেন। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, আমাদের বংশে পাগলামির চর্চ্চা হচ্ছে পুরুষানুক্রমে। মামাদের দৌলতে আমি বি-এ পাশ দিয়ে বিয়ে করি। তারপর নিজেদের গ্রামে ফিরে গিয়ে

সংসার পাতি। বাবার লোহার সিন্দুকে যা ছিল, তা নিয়ে বড়মানুষী করতে না পারলেও মোটা ভাতকাপড়ের অকুলান হল না। বলে রাখা ভাল, মামারা ছাড়া আমার আর কেউ আত্মীয়-স্বজন ছিলেন না।

ক-বছর কাটল বেশ।

নির্ম্মলা অল্পবয়সেই পাকাগিন্নী হয়ে উঠেছিল; তার যত্নে আমার গৃহস্থালীতে সর্ব্বদাই লক্ষ্মী-শ্রী বিরাজ করত। আমাদের আর কোন দুঃখ ছিল না—কেবল একটি সন্তানের অভাবে নির্ম্মলা মাঝে-মাঝে মুখখানি ভার করে থাকত।

নির্ম্মলা যে স্বধু গুণে লক্ষ্মী ছিল, তা নয়; রূপেও সে ছিল সরস্বতীর মতন। যেমন মুখ, তেমনি রং, তেমনি গড়ন,—আমার মত গৃহস্থের সংসারে সে-যেন ভাঙ্গাঘরে চাঁদের আলো! তাকে নিয়ে আমিও কিছু বিব্রত হয়ে থাকতুম। কেন, তা বলছি।

নির্ম্মলার রূপের খ্যাতি সারা গাঁয়ে রটে গিয়েছিল। পাড়ার কতকগুলো বকাটে ছোঁড়াকে আমার বাড়ীর আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াতে দেখতুম। দু-চারখানা উড়ো চিঠিও আমার বাড়ীর মধ্যে এসে পড়েছিল। অবশ্য, সে-সব চিঠির কথা আমি টের পেতুম না,—নির্ম্মলা নিজেই যদি সেগুলো এনে আমাকে না দেখাত।

ডাক্তার! স্পষ্ট কথা বল্‌তে কি—স্ত্রীলোককে আমি তেমন ভাল চোখে দেখতুম না। নারী, ঘরের লক্ষ্মী হতে পারে,—কিন্তু লক্ষ্মীর মতই সে চঞ্চলা—কখন্ যে কার উপর সদয় হবে, শিবের বাবাও বলতে পারেন না। শক্ত পুরুষের পাল্লায় না পড়লে রমণী কখনো ঠিক থাকৃতে পারে না—এই ছিল আমার ধারণা। যে বাগানে মালীও নেই, বেড়াও নেই, সে বাগানের ফুল যে আর-পাঁচজনে লুঠে নেবে—এ ত জানা কথা। কামিনীফুলকে চোখে-চোখে রাখতে হয়,—নইলে, কোন্‌দিন দেখবে, হয়ত তোমার গলার মালা অন্যের গলায় দুল্‌ছে!

সুতরাং নির্ম্মলাকে আমি পৈ-পৈ করে মানা করে দিতুম, অন্দরের আড়াল থেকে সে যেন কোনমতে বাইরে না বেরিয়ে পড়ে।

নির্ম্মলা কথা বড় বেশী কইত না—উত্তরে একবার 'আচ্ছা' বলেই অন্য কাজে চলে যেত।

ঘরের দিকে এবং পরের দিকে—দুদিকেই আমার দৃষ্টি ছিল সমান সতর্ক। "কোলে থাকিলেও নারী রেখ সাবধানে"—এটা বোধ হয় কবি ঠেকে শিখেছিলেন, কেননা, এর-চেয়ে খাঁটি কথা আর হতে পারে না।

একদিন ভিন্-গাঁ থেকে ফিরে আসছি; বাড়ীর কাছে এসে,

দেখি, একটা ছোঁড়া বাইরে থেকে দরজার ফাঁক্ দিয়ে আমার বাড়ীর ভিতরপানে কি দেখছে। কি যে দেখছে, তা বুঝ্‌তে আমার দেরি হল না। এখানে কথার চেয়ে গায়ের জোরের দাম বেশী। অতএব, আমি ছুটে গিয়ে তার গণ্ডে এমন এক প্রচণ্ড চড় কসিয়ে দিলাম যে সামলাতে না পেরে দড়াম করে সে, মাটির উপরে পড়ে গেল। একেবারে অজ্ঞান! সেই অজ্ঞানতা থেকে গ্রামের আর আর সকলেই পরম জ্ঞানলাভ কর্‌লে; কেননা এরপর হতে আর কারুকে আমার বাড়ীর ত্রিসীমানায় উঁকিঝুঁকি মারতে দেখি নি। আমিও জেনে রাখলুম, এ লোকগুলোর রূপের প্রতি তৃষ্ণা যত, কিল-চড়ের প্রতি বিতৃষ্ণাও তত। এদের ফুল তোলবার সখ আছে বিলক্ষণ—কিন্তু কাঁটা দেখলেই হাত-গুটিয়ে পিছিয়ে দাঁড়ায়। দুনিয়ার কত সাধু যে সুধু এই কাঁটার ভয়েই দায়ে পড়ে সাধু,—তা ঠিক করে বলা দায়!

একদিন বিকালে বাড়ীর সুমুখে পাইচারি করছি,—হঠাৎ দেখলুম এ-দিকপানে একজন লোক আস্‌ছে।

লোকটি বয়সে যুবা, দেখতেও সুশ্রী। চোখে সোনার চশমা, হাতে বাঁধানো ছড়ি—পরণের কাপড়-চোপড় দেখলে বোঝা যায়, বাবুআনার দিকে লোকটির ঝোঁক আছে ষোল আনা। ছেলেবেলায় পরের বাড়ীতে পরের খেয়ে মানুষ

হয়েছি, নিজে কখনো বাবুআনার বায়না ধরবার সুবিধা পাইনি। এইজন্যে কিনা জানি-না,—যারা বাবুআনা করত তারা ছিল আমার চোখের বিষ। কাজেই এই সভ্য-ভব্য নব্যবাবুটির প্রতি গোড়া থেকেই আমার মন চটে গেল।

লোকটা বরাবর আমার সুমুখে এসে দাঁড়াল। ছড়ি দিয়ে আমার বাড়ীটা দেখিয়ে সে বল্‌লে, "এ বাড়ীখানা কার মশাই ?"

আমি শুষ্ক স্বরে বল্‌লুম, "মশায়ের সে খোঁজে দরকার ?"

লোকটি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বল্‌লে, "না, না,—এটা কি বিনয়বাবুর বাড়ী—আমি তাঁকেই খুঁজচি।"

"মশায়ের আসা হচ্চে কোথা থেকে ?"

"আমি সম্প্রতি এখানকার সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার হয়ে এসেছি।"

লোকটি পদস্থ বটে ! কাজেই একটু নরম হয়ে বল্‌লুম, "আজ্ঞে, আমারই নাম বিনয়বাবু।"

আগন্তুক একবার আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে বল্‌লে, "আপনিই নির্ম্মলার স্বামী ? নমস্কার বিনয়বাবু, নমস্কার !"

হুঁ ! 'বিনয়বাবু' বলতে এ ঠিক করে নিলে,—'নির্ম্মলার স্বামী' ! অর্থাৎ পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, নির্ম্মলাকে এ চেনে

এবং কান টান্‌লে মাথা আসে বলে, 'বিনয়বাবু'কে এ খুঁজছে নির্ম্মলারই খোঁজ পাবার জন্যে!

আগন্তুক বল্‌লে, "তাহলে বিনয়বাবু, বাড়ীর ভিতরে একবার দয়া করে বলে আসুন গে, যে ললিত এসেছে দেখা কর্‌তে।"

কে এ ললিত?—ভাবতে-ভাবতে অন্দরে গেলুম। নির্ম্মলা তখন বসে বসে একটা বেড়ালের গলায় ঘুঙ্গুর পরাচ্ছিল।

আমি বল্‌লুম, "হ্যাগা, ললিত নামে কারুকে তুমি চেন?"

নির্ম্মলা একবার চম্‌কে উঠ্‌ল। সে চম্‌কানি আমার চোখ এড়াল না।

"বেড়ালটাকে ছেড়ে দিয়ে নির্ম্মলা বল্‌লে, "কেন গা?"

নির্ম্মলার মুখ-চোখের উপর নজর রেখে আমি বল্‌লুম, "ললিত বলে একটি লোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। কে সে?"

নির্ম্মলার মুখ প্রথমে কেমন-একরকম হয়ে গেল। তার-পরেই সে কিন্তু খুব খুসী হয়ে উঠল। বল্‌লে, "ললিত এসেছে? যাও, যাও, ডেকে আন এখানে!

আমি অটলভাবে বল্‌লুম, "যা জিজ্ঞেস করলুম—তার জবাব কৈ? ললিত তোমার কে হয়?"

নির্ম্মলা একটু থতমত খেয়ে বল্‌লে, "ললিতের বাপের

সঙ্গে আমার বাবার খুব বন্ধুত্ব ছিল। ললিত আমাকে ছেলেবেলা থেকেই জানে।"

আমি খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। তারপর স্থিরস্বরে বল্লুম, "ললিত ছেলেবেলা থেকে তোমাকে যখন জানে, তখন এটাও বোধ হয় জানে যে, তুমি এখন পরস্ত্রী। সে তোমার আত্মীয় নয়, তার সঙ্গে তোমার দেখা হওয়া অসম্ভব।"

নির্ম্মলা কাঠের পুতুলের মত ঘাড় হেঁট করে বসে রইল।

বাইরে গিয়ে ললিতকে বল্লুম, "আমার স্ত্রী এখন পাড়ায় নেমন্তন্নে গেছে।"

ললিত একবার আড়চোখে আমার দিকে চাইলে; বল্লে, "আচ্ছা, কাল আমি আবার আসব এখন।"

—"ললিতবাবু! কাল সে তার বোনের বাড়ী যাবে; ফিরতে রাত হবে। তার সঙ্গে আপনার দেখা হল না বলে আমি দুঃখিত।"

সে বল্লে—"নির্ম্মলার–বোন! সে কি রকম! সে ত এখানে থাকে না!"

আমি থতমত খেয়ে বল্লুম—"আপনার বোন নয়—দূর-সম্পর্ক!"

আমার দিকে ব্যঙ্গদৃষ্টি নিক্ষেপ করে আর কিছু না বলে

ললিত ছড়ি ঘোরাতে-ঘোরাতে চলে গেল। বেশ বুঝলুম, আমার চালাকি সে ধরে ফেলেছে।

বাড়ীর দিকে ফিরিবামাত্র দেখলুম, ছাদের এক-কোণে লুকিয়ে নির্ম্মলা দাঁড়িয়ে আছে। ওখানে কেন সে?—ললিতকে দেখছিল?

মনে মনে নিজের বুদ্ধিকে ধন্যবাদ দিলুম। ভাগ্যে পতঙ্গের সামনে আগুনকে আনি-নি।

নির্ম্মলার এক বোন ছিল, নাম কমলিনী। সে আজ এক বছর হল, বিধবা।

হঠাৎ একদিন খবর এল, কমলিনী কুলত্যাগ করেছে।

খবরটা শুনে আমি কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হলুম না! এ ত স্বাভাবিক!

আরও সাবধান হলুম। কমলিনী যে রক্তে জন্মেছে, নির্ম্মলার দেহেও ত সেই রক্তই আছে! অতএব—

অতএব বাগানের মালীকে সতর্ক হতে হবে।

নির্ম্মলা মাঝে-মাঝে পাড়ার মেয়ে-মহলে তাস খেলতে যেত। আমি বারণ করে দিলুম, আমার হুকুম-ছাড়া সে যেন আর কোথাও না যায়। নির্ম্মলা 'হাঁ-না' কিছুই বললে না।

এম্‌নি সময় হঠাৎ আমাকে ঘুষ্‌ঘুষে জ্বরে ধর্‌লে। গাঁয়ে একজন বাঙ্গালায় পাশ করা ডাক্তার ছিল, মাস-দু-এক তার চিকিৎসায় রইলুম। তার ওষুধে সুফলের চেয়ে কুফল হল বেশী। দিনে-দিনে আমি ক্রমেই কাহিল হয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লুম; তারপর জ্বরের সঙ্গে দেখা দিলে—খুক্‌খুকে কাশি।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আমার পা টিপে দিতে দিতে নির্ম্মলা মৃদুস্বরে বল্‌লে, "হ্যাঁ গা, এ ডাক্তারকে দিয়ে অসুখ যখন কম্‌লো না, অন্য ডাক্তার ডাক না!"

আমি বল্‌লুম, "গাঁয়ে আর ডাক্তার কৈ?"

নির্ম্মলা থেমে থেমে বল্‌লে, "আচ্ছা, ললিতকে ডাক্‌লে হয় না? সে ত সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার, হাত-যশ না থাক্‌লে সে অতবড় কাজ পেত না।"

আমি তীব্র তিক্ত স্বরে বলে উঠলুম, "না!"

আমার কণ্ঠস্বরে নির্ম্মলা বোধ হয় ব্যথা পেয়েছিল। কারণ পা টিপ্‌তে-টিপ্‌তে তখনি সে একবার থেমে পড়্‌ল। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে তবে সে আবার পা-টেপা সুরু করলে।

ললিত ডাক্তারের কথা যে আমার মনে ছিল না, তা নয়। কিন্তু তার সুন্দর মুখকে আমি ভয় করি। নির্ম্মলা যে তাকে চায়,—সে কথা সেইদিনই বুঝেছি, যেদিন সে ছাদ-থেকে লুকিয়ে তাকে দেখ্‌ছিল! সুতরাং এটা আন্দাজ করা শক্ত

নয় যে, আমার এই অসুখের অছিলায় নির্ম্মলা ললিতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে চায়!

ডাক্তার, চিঠি পড়্‌তে পড়্‌তে আমার মনের ক্ষুদ্রতা দেখে নিশ্চয়ই তুমি বিরক্ত হয়ে উঠ্‌ছ। নিশ্চয়ই ভাবছ যে, আমি কি নীচ—কি হীন স্বভাবের লোক! বাস্তবিক, আজ এই গারদে বসে, নিজের চরিত্র বিশ্লেষণ করে চিঠি লিখ্‌তে লিখ্‌তে আপন-স্বভাবের জন্য আমি আপনিই লজ্জিত হয়ে উঠছি।

সন্দেহ-রোগটা আমার ধাতের সঙ্গে কেমন মিশে গিয়েছিল। এ রোগ যদি আমার না থাকত, তবে আজ কি আমাকে কেউ এই সুন্দর পৃথিবী থেকে, এই বিচিত্র সংসার থেকে, সেই বিমল প্রেমের আলিঙ্গন থেকে, সেই স্বাধীন উদ্দাম জীবন থেকে বঞ্চিত রাখতে পারত? ডাক্তার,—ডাক্তার, আমি লম্পট নই, মাতাল নই, অন্য কোন পাপে পাপী নই—কিন্তু এক সন্দিগ্ধ প্রকৃতির জন্যই আজ আমি সকল-হারা কাঙ্গাল, মানুষ হয়েও অমানুষ, জগতে থেকেও জীবন্মৃত!

থাক্—যা বল্‌ছিলুম—

ললিত ডাক্তারকে ডাকা হল না।

পরদিন আমার চিকিৎসা করতে এক কবিরাজ এলেন। কবিরাজ প্রাচীন বটে, কিন্তু অর্ব্বাচীন কি প্রবীণ সেটা জানতুম না।

তবে তিনি যে স্পষ্টবক্তা এবং রোগীর কাছে শিশুর মত সরল, তার পরিচয় পেলুম।

চোখ বুজে অনেকক্ষণ আমার নাড়ী-পরীক্ষা করে তিনি সুধু গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বল্লেন,—"হুঁ।"

এই "হুঁ"র মানে কি? জিজ্ঞাসা করলুম, "জ্বর কতদিনে সারাতে পার্বেন?"

কবিরাজ মাথা তুলে ঢুল-ঢুল চোখে কড়িকাঠের দিকে তাকালেন,—অর্থাৎ, জ্বর সারা না সারা—সমস্তই ভগবানের হাত।

একটু বিরক্ত হয়ে বল্লুম, "কব্রেজ মশাই, শুধু ভগবানকে ডেকে যদি অসুখ সারাতে হয়, তবে আপনাকে ডেকে লাভ কি?"

কবিরাজ বল্লেন, "আমরা নিমিত্ত মাত্র। বাবা, তোমার অসুখ কিছু গুরুতর।"

—"অসুখটা কি?"

"—যক্ষ্মা!

আমার বুকটা ছাঁৎ করে উঠল।

দরজার কাছে ধুপ্ করে একটা শব্দ হোল। সেখানে ঘোমটা দিয়ে নির্ম্মলা দাঁড়িয়েছিল—চেয়ে দেখি, মাটীর উপর সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে!

যক্ষ্মা !

সারাদিন—সারাদিন বিছানায় আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে রইলুম,—মনে হতে লাগ্‌ল অশরীরী মৃত্যু যেন এখনি এসে আমার অপেক্ষায় দরজা আগ্‌লে বসে আছে। যক্ষ্মা! এই দুটি অক্ষরের সঙ্গে কি বিপুল যন্ত্রণা গাঁথা আছে,—কি আতঙ্কের ভাব মেশানো আছে! আজ আমি যেন এই পৃথিবীতে থেকেও পৃথিবীর নই—এরি মধ্যে পৃথিবীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক যেন ঘুচে গেল। ফাঁশীর হুকুম পেলে কয়েদীর মনে কি এমনিতর ভাবের উদয় হয়?

এতদিন জ্বর হলেও আমি উঠে, বসে, নড়ে-চড়ে বেড়াতুম,—তাতে কোন কষ্ট হোত না। কিন্তু, ব্যাধির নাম শুনে পর্য্যন্ত আমি একেবারে কাবু হয়ে পড়েছি; মনে হচ্ছে, কে যেন আমার বুকের উপর জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দিয়েছে,—উঠে বসি, সাধ্য কি!

নির্ম্মলা এসে আমার মুখে ওষুধ ঢেলে দিলে। উদাস চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলুম। আজ তার মুখ মলিন, কেশে বেশে কোন শ্রী নেই। কিন্তু এই বিষণ্ণতা ও মলিনতার মধ্যেই তার রূপের শিখা যেন বেশী জ্বলন্ত হয়ে উঠেছে।

আস্তে আস্তে বল্লুম, "নির্ম্মল,—আমি আর বেশীদিন নই।"

অন্য কোন স্ত্রীলোক হয়ত এখানে পাড়া কাঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ত। কিন্তু নির্ম্মলা সুধু বল্‌লে, "ভয় কি, তোমার কিচ্ছু হয়-নি।"

—"কিচ্ছু হয়-নি! এত সহজে তুমি আমার এ রোগটাকে উড়িয়ে দিতে চাও? আরো বেশী কিছু হলে তোমার ও শিঁথের সিঁদুর কোথায় থাক্‌বে নির্ম্মল?"

নির্ম্মলা হঠাৎ পিছন ফিরে দাঁড়াল—তারপর জানালাটা বন্ধ করে দিলে। আমি বুঝলুম, সে পিছন ফিরেছে মুখের ভাব লুকোবার জন্যে—জানালা বন্ধ করে দেওয়া ছলমাত্র।

আমি স্তব্ধ হয়ে রইলুম। নির্ম্মলার বিড়ালটা বিছানার উপরে লাফিয়ে উঠ্‌ল, তারপর আরামে ঘুমোবার মতলবে আমার বুকে চড়ে বস্‌ল। নির্ম্মলা ছুটে এসে হঠাৎ তার বিড়ালকে এমন এক চড় মারলে যে, আয়েসের আশা ছেড়ে সে একলাফে আমার বুক থেকে নেমে ল্যাজ তুলে সরে পড়্‌ল। ব্যাপারটা তোমাদের চোখে সামান্য ঠেক্‌বে—কিন্তু আমার কাছে এ তুচ্ছ নয়। কারণ, 'পুসী'কে এর আগে নির্ম্মলার হাতে কখনো মার খেতে দেখিনি!

নির্ম্মলাকে এইমাত্র কড়া কথা বলেছি বলে মনে একটা ঘা লাগল। গাঢ়স্বরে ডাকলুম, নির্ম্মল!"

সে আমার কাছে এসে দাঁড়াল।

—"বেড়ালটাকে তাড়িয়ে দিলে কেন ?"

—"কোথেকে এসে নোংরা পায়ে বিছানায় উঠেছিল, তাই।"

—"কেন, আগেও ত সে গঙ্গাজলে পা না ধুয়েই বিছানায় উঠ্‌ত, তখন ত ওকে মারতেও না, তাড়াতেও না।"

নির্ম্মলা চুপ করে রইল।

—"সত্যি করে বল দেখি, পাছে আমার কষ্ট হয় বলেই তুমি ওকে মেরেছ কি না ?"

সে কথা কইলে না।

—"নির্ম্মল—"

—"বল।"

—"আমার কষ্টে তুমি কষ্ট পাও ?"

নির্ম্মলা একবার আমার চোখে তার চোখ রেখেই নামিয়ে নিলে।

—"নির্ম্মল, শোন।"

—"কি ?"

—"কাছে এস, আরো কাছে।"

—"বল।"

—"আমাকে তুমি ভালবাস ?"

নির্ম্মলার মুখে হঠাৎ একটি তরল হাসি খেলে গেল ;

তারপরেই,—বোধ হয় আমার অসুখের কথা ভেবেই—তার সে হাসি থেমে গেল। বল্‌লে, "তোমার আজ হয়েছে কি, এত আবোল-তাবোল বক্‌ছ কেন?"

—"নির্ম্মল, তুমি কি আমার কথার উত্তর দেবে না? আমাকে ভালবাস? বল, বল!"

নির্ম্মলা খানিকক্ষণ অবাক আশ্চর্য্য হয়ে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে মুখ নামিয়ে, আমার ঠোঁটের উপরে তার দুখানি তপ্ত ঠোঁট রেখে, দুহাতে আমার গলা জড়িয়ে ধর্‌লে।

স্বামী হতে গেলে স্বভাবটা কিছু কর্কশ, কিছু গম্ভীর হওয়া চাই—এই ছিল আমার ধারণা। কিন্তু কেন জানি না, সেদিন আমার মুখ থেকে গাম্ভীর্য্যের মুখোস কি করে হঠাৎ খসে পড়েছিল। তার পরের দিন সকালে নিজের ছেলেমানুষীর কথা ভেবে নিজেই যে লজ্জা পেয়েছিলুম—আজও তা ভুলি-নি। সামান্য কারণেই কেন যে প্রাণ চঞ্চল হয়, মুখ দিয়ে কেন যে শিশুর হাল্‌কা কথা বেরিয়ে পড়ে, এ-এক মহা রহস্য!

কিন্তু তবু আজ আমার মনে হচ্ছে, সে-সময় সত্যই যদি ছেলেমানুষ থাক্‌তে পারতুম, আজ তাহলে আমাকে এই দুঃখের কাহিনী লিখতে হোত না!

পরদিন ভিন্নগ্রাম থেকে এক পাশ-করা ডাক্তার আনালুম। কারণ 'শতমারী'র বিষবড়ি খেয়ে মরার চেয়ে পাশ-করা ডাক্তারের হাতে পটল তোলা ঢের ভাল।

ডাক্তারের মুখে এই একটু ভরসা পেলুম যে, আমার রোগ এখনো সাংঘাতিক হয়ে ওঠে-নি। হয়ত, সেটা মিথ্যা প্রবোধ!

চিকিৎসা চল্‌তে লাগল। ঘরে ওষুধের শিশি খুবই বাড়্‌ল, কিন্তু রোগ কম্‌ল না। এমনি সময় আর এক ঘটনা ঘট্‌ল।

সেদিন ভর্‌সন্ধ্যায় বাদল নাম্‌ল,—নবীন আষাঢ়ের প্রথম জলধারা। আমি বিছানার উপর বালিসে পিঠ রেখে বসেছিলুম,—জানালাটা একটুখানি ফাঁক্‌ করে দিয়ে। গুমোট্‌ করা ঘরের মধ্যে মাঝে-মাঝে ঝুরুঝুরু জলের ছাট্‌ এসে গায়ে লাগ্‌ছে—আঃ, সে কি মিষ্টি! গাছের পাতায়, গাঁয়ের পথে, খানায়-ডোবায় বৃষ্টিবিন্দুগুলি যেন শিশুর মত খেলায় মেতে কলরব কচ্ছিল,—আর আমি আনমনে বসে-বসে বর্ষার 'জলতরঙ্গে, বাদলের সেই মেঠো সুর শুন্‌ছিলুম।

হঠাৎ নীচের পথে চোখ পড়ল; সন্ধ্যার আবছায়ায় স্পষ্ট বোঝা গেল না,—কিন্তু মনে হোল, কে-একটা লোক যেন ছাতি-মাথায় দিয়ে আমার বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়্‌ল।

প্রথমে ভাবলুম, ডাক্তার। কিন্তু, একে-ত ডাক্তারের

এখন আসবার কথা নয়, তায় এই বৃষ্টি! আচ্ছা; ডাক্তার ত এখানেই আসবেন, দেখা যাক্।

একে-একে পাঁচটি মিনিট কেটে গেল। না, ডাক্তার নয়; তবে, কে ও? আমারই চোখের ভ্রম? না, তাই-বা কি-করে বলি!

আস্তে-আস্তে বিছানা থেকে উঠ্লুম। দরজাটা ফাঁক্ করে দেখলুম, রান্নাঘরে নির্ম্মলা নেই। এ-সময় তার ত এখানেই থাকবার কথা,—কোথায় গেল সে?

নিজের অসুখের কথা ভুলে গেলুম। পা টিপে-টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে, একটি, দুটি, তিনটি ঘর পেরিয়ে এলুম,—নির্ম্মলা কোথাও নেই।

হঠাৎ দেখলুম, বৈঠকখানা থেকে আলোর রেখা বাইরে এসে পড়েছে। খুব সন্তর্পণে, চোরের মতন দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম।

ধারালো তীরের মত একটা অচেনা গলার আওয়াজ আমার কাণে এসে লাগ্ল।

কে বল্ছে,—

"না বুঝে তখন বদ্-সঙ্গে মিশেছিলুম, তোমার বাবা তাই তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চাইলেন না। নির্ম্মল, এখন আমি আর মদ খাই না বটে, কিন্তু তোমাকে—"

বাধা দিয়ে আমার স্ত্রী বল্‌লে, "ললিত, ও কথা আর তুলো না। ছেলেবেলায় আমরা যেমন দুই ভাই-বোনের মত একসঙ্গে ছিলুম, এখনো তেমনি করে আর থাক্‌তে না পারলেও, তুমি আমার ভাই, আমি তোমার বোন।"

নির্ম্মলার স্বর কি অস্বাভাবিক !

ললিত,—সেই ডাক্তার ললিত, যে একদিন আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, যাকে আমি সন্দেহ করে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম, আমাকে লুকিয়ে তারই সঙ্গে নির্ম্মলার এ কি কথা হচ্ছে !

নির্ম্মলা দরজার দিকটা একবার দেখে নিয়ে বল্লে "ললিত, শোন, আমার বেশী সময় নেই, উনি টের্ পেলে আর রক্ষে রাখবেন না। তোমাকে এখানে আসবার জন্যে কেন চিঠি লিখেছি, তা ত জান না ?"

ললিত বল্‌লে, "না।"

"আমার স্বামীর বড় অসুখ।"

"কি অসুখ ?"

নির্ম্মলা অল্পকথায় আমার রোগের বর্ণনা করলে।

ললিত বল্‌লে, "আমাকে কি করতে বল ?"

—"ললিত, তুমি ডাক্তার। রোগের যে লক্ষণ বল্‌লুম,

তা শুনে তোমার কি মনে হয়? এখানকার পাড়াগেঁয়ে ডাক্তার কব্‌রেজ সব হাতুড়ে। তাদের কথায় বিশ্বাস নেই।"

—"মুখে শুনে কি রোগ-ধরা চলে নির্ম্মল?—রোগী দেখতে হবে।"

—"সে হবে না।"

—"কেন?"

নির্ম্মলা থেমে-থেমে বল্‌লে, "তুমি যে এখানে আস, সেটা উনি পছন্দ করেন না।"

"কেন?"

একটু ইতস্তত করে নির্ম্মলা বল্‌লে, "না, সে আমি বল্‌তে পারব না।"

ললিত খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ক্ষুব্ধস্বরে বল্‌লে, "থাক্‌, আর বলতে হবে না, বুঝেছি। কিন্তু রোগী না দেখে এত বড় রোগ ধরা অসম্ভব।"

নির্ম্মলা কাতরস্বরে বল্‌লে, "ললিত, ললিত, তবে আমার কি হবে?"

ললিত বললে, "একটা কথা বলি শোন। তোমার স্বামীর যদি সত্যই যক্ষ্মা হয়ে থাকে, তবে তুমি বাপের বাড়ী যাও—

"এ কি কথা ললিত!"

—"হ্যাঁ। অবশ্য, যাবার আগে রোগীর সেবার জন্যে একজন ভাল লোক ঠিক করে যেতে হবে।"

—"সে কি হয়?"

—"হতেই হবে। এ-সব রোগীর কাছে স্ত্রী থাক্‌লে রোগীরই অনিষ্ট!"

নির্ম্মলা কিছুক্ষণ ভেবে বল্‌লে, "ওঁকে যদি জান্‌তে, ললিত! আমাকে উনি এখান থেকে এক-পা নড়তে দেবেন না।—অনেক ক্ষণ হয়ে গেল, আর নয়। আজ আসি।"

আমি পা টিপে-টিপে আবার উপরে উঠলুম। তখনো বৃষ্টি পড়ছিল—জলে আমার কাপড়-চোপড় অল্প-অল্প ভিজে গেল।

নির্ম্মলা ঘরে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কেমন আছ?"

কোন জবাব না দিয়ে পাশ ফিরে শুলুম। রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছিল।

নির্ম্মলা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, বোধ হয় ভাবছিল, আমি জবাব দিলুম না কেন!

হঠাৎ কি দেখে সে আমার পায়ে আর কাপড়-চোপড়ে হাত দিলে। বেশ বুঝলুম, সে চমকে উঠ্‌ল।

আমি মুখ ফিরিয়ে তার দিকে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলুম।

নির্ম্মলা আমার দৃষ্টিতে যেন আহত হয়ে দু-পা পিছনে হটে গেল। তারপর উদ্বিগ্ন স্বরে বল্লে,—"তুমি—তুমি কি বাইরে গিয়েছিলে?"

যতটা-পারা-যায় গলাটা ভারি করে বললুম,—"হুঁ। তুমি মর। আমিও তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি।"

মড়ার মত সাদা মুখে, ঘাড় হেঁট করে নির্ম্মলা ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল—আমার দিকে আর চাইতেও পারলে না।

সে কি বুঝ্তে পেরেছে, আমার চোখে ধুলো দেওয়া কত শক্ত?

বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ভাবতে লাগলুম।

আমি ত মরবই! যে রোগে ধরেছে, কথায় বলে, তা 'শিবের অসাধ্য রোগ'। সংসারের খাতা থেকে আমার নাম কাটা গেল বলে!

আমি ম'লে নির্ম্মলার কি হবে? সে কোথা থাকবে—কার কাছে? তার বাপ নেই, মা নেই,—এক ভাই আছে, সেও গরীব, আবার মাতাল। নির্ম্মলার এই বয়স, এই রূপ,—সংসারের বিষম পাকচক্রে পড়লে সে কি আর আপনাকে সামলাতে পারবে?

তারপর,—ঐ ললিত! নির্ম্মলার সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল—সে এখনো নির্ম্মলাকে ভুলতে পারে-নি নিশ্চয়। ছেলেবেলা থেকে তারা দুজনে দুজনকে জানে—তাদের মধ্যে এখনো একটা ভালবাসার টান থাকা খুবই স্বাভাবিক। নির্ম্মলা এখনো তাকে দেখ্‌তে চায়—এর প্রমাণও হাতে-হাতে পেয়েছি।

মাঝখান থেকে তাদের মেলা-মেশায় বাধা দিচ্ছি—আমি। নির্ম্মলা মনে-মনে সত্যই আমাকে ভালবাসে—না, কেবল কর্ত্তব্যের জন্যে যেটুকু করবার তা করে—এটা ঠিক জানি না; কিন্তু সে যে আমাকে ভয় করে, এ-কথা বেশ বোঝা যায়।

ললিত এখনি পরামর্শ দিচ্ছে, আমাকে একলা ফেলে নির্ম্মলা চলে যাক্। নির্ম্মলাও তার কথা শুনত—যদি না আমাকে ভয় করত। আমি বেঁচে থাকতেই এই!

কমলিনী নির্ম্মলার বোন—এক রক্তে এদের জন্ম। যতদিন সধবা ছিল, ততদিন কমলিনীর নামে ত কিছুই শুনি-নি। বিধবা হয়ে কমলিনী বাপের বাড়ী গেল, তারপর বছর ঘুরতেই শুনলুম, সে কুলত্যাগ ক'রে কুল ছেড়ে অকূলে ভেসেছে!

কমলিনীর জীবনে যা ঘটেছে, নির্ম্মলার জীবনেও তা ঘট্‌বে না কেন? বিশেষ, নির্ম্মলার সামনে আর এক প্রলোভন আছে; ললিত তার বাল্যবন্ধু, ললিতকে এখনো সে দেখতে

চায়, ললিতের সঙ্গে তার বিয়ের কথাও হয়েছিল. ললিত এখনো বিয়ে করে নি। ঐ সুপুরুষ ললিতকে আমি ভয় করি।

সে রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কেবল নির্ম্মলা আর ললিতকে স্বপ্নে দেখতে লাগলুম। বারবার ঘুম ভেঙ্গে যেতে লাগল। শেষবারে দেখলুম,—এই ঘরে, এই বিছানায় বিধবার বেশে বসে আছে নির্ম্মলা, আর তার পায়ের তলায় ললিত! দরজার কাছে আমি অসহায়ের মত, ম্লান-কাতর চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমি তাদের দেখ্‌তে পাচ্ছি—তারা আমায় দেখ্‌তে পাচ্ছে না। কারণ, আমি তখন মৃত; দাঁড়িয়ে আছে,—সে আমার প্রেতাত্মা!

এক-চমকে ঘুম ছুটে গেল। ঘর্ম্মাক্ত দেহে, বিছানা থেকে লাফিয়ে মেঝেতে গিয়ে পড়লুম। জানালার কাছে ছুটে গেলুম। তখনো বৃষ্টি পড়্‌ছিল।

চীৎকার করে বলে উঠলুম, “এ হবে না, এ হবে না! নির্ম্মলা আমার—আমি তাকে ভালবাসি—মরে গিয়েও ভালবাস্‌ব! মরবার আগে আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব নির্ম্মল—নিয়ে যাব, নিয়ে যাব!”

অন্ধকারে হঠাৎ কে আমাকে দু হাতে প্রাণপণে জড়িয়ে ধর্‌লে। আমি বিহ্বলের মত বল্‌লুম,—“কে তুমি?”

—“ওগো, আমি—আমি—”

"—অ্যাঁ নির্ম্মল! শোন, আমি তোমাকে নিয়ে যাব—ছাড়্‌ব না!"

—"কি বল্‌ছ গো—ও কি বল্‌ছ! তোমার কি হয়েছে?"

তখন আমার চমক ভাঙ্গল। মাথাটা ঘুরে উঠ্‌ল—পা টল্‌তে লাগল। কোনরকমে নির্ম্মলার গা ধরে বেহুঁসের মত মাটীর উপরে ধুপ্‌ করে বসে পড়লুম।

ডাক্তার, ডাক্তার, সেই রাত্রে আমার মাথার ভিতরে যে রকম ভাব এসেছিল, এখনো ফি-বছরের যে-সময়টায় আমি পাগল হয়ে যাই, আমার মাথায় ঠিক তেমনি ধারা ভাব আসে!

সে রাত্রি থেকেই যে আমাকে এই উন্মাদ-রোগ আক্রমণ করে নি, তা কে বল্‌তে পারে?

তুমি বল্‌তে পার, ডাক্তার?

ওঃ, সে স্বপ্নটা কি বাস্তব! লিখতে লিখতে এখনো আমার চোখের উপর সেই দৃশ্য আগুনের রেখায় জেগে উঠ্‌ছে আর আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে। মনে হচ্ছে, আমি বুঝি আবার এখনি পাগল হয়ে যাব! মাগো, এ কি যন্ত্রণা—কি যন্ত্রণা!

দু'চারদিন পরেই বুকে ব্যথা হয়ে নির্ম্মলা ভয়ানক জ্বরে পড়্‌ল। বাড়ীতে আমরা দুটি প্রাণী,—দুজনেই শয্যাশায়ী;

কে যে কাকে দেখে তার ঠিক নেই। এক-দিন নির্ম্মলা নিজে থেকে আমার সঙ্গে একটাও কথা বলে নি। যখনি তাকে দেখেছি, তখনি মনে হয়েছে, সে যেন কি দুর্ভাবনা ভাব্‌ছে। আমি ডাকলে বিমর্ষ মুখে আমার কাছে এসে দাঁড়াত, কোনও কথা জিজ্ঞাসা করলে সে অত্যন্ত নীরস একটা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিত—যেন নিতান্ত দায়ে পড়েই।

তার এমনধারা ভাবভঙ্গি দেখে, আমার গা যেন জ্বলে যেত। আমি কি তার চক্ষুঃশূল? কেন, এমন কি দোষে দোষী আমি?—ক্রমেই আমার রাগ বেড়ে উঠ্‌ছিল;—তার এই নির্লিপ্ত অবহেলার ভাব আমার রুগ্ন মাথাটাকে যেন বিগ্‌ড়ে দিচ্ছিল!

কি ভাবছে সে? কেন ভাবছে? কার জন্যে এ ভাবনা? মনে মনে এমনি নানান্ প্রশ্ন জাগ্‌তে লাগল। সে কি আমাকে ঘৃণা করে? সে কি ললিতের কথা ভাব্‌ছে? আমাকে ছেড়ে পালাতে চায়?

ললিতকে মনে পড়লেই, সেই গুপ্ত সাক্ষাৎ, সেই ভীষণ স্বপ্নদৃশ্য স্মরণ হয়—আর আমার মাথা যেন আগুনের মত গরম হয়ে ওঠে—আমি যেন পাগল হয়ে যাই।

এমন সময় নির্ম্মলা অসুখে পড়্‌ল! আমাকে যে ডাক্তার

দেখ্‌ছিলেন, তিনিই তাকে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। প্রথম দু তিন দিন অসুখ ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌তে লাগল, ডাক্তার পর্য্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন। কিন্তু আমার একটুও ভয় বা ভাব্‌না হোল না।

ডাক্তার! তুমি কি বিশ্বাস কর্‌বে যে, নির্ম্মলার তখন মৃত্যু হলে, আমি খুসি হতুম! হাঁ্যা, সত্যি কথা। আমি ত মর্‌বই,—তবে সে কেন বাঁচবে? আমাকে স্বার্থপর ভাব্‌ছ? না, আমি তা নই। নির্ম্মলাকে আমি ভালবাসি,—প্রাণের মত ভালবাসি। সে ভালবাসার তল নেই, সীমা নেই, অন্ত নেই। কিন্তু বলেছি ত, নারীর চঞ্চল মনকে আমি বিশ্বাস করি না। তার উপর নির্ম্মলার বোন কমলিনী আমার চোখ খুলে দিয়েছে। আমি যদি মরি,—তবে তার নবীন, নধর, পুষ্পিত যৌবন নিয়ে কুচক্রীর বিষাক্ত নিশ্বাসে নির্ম্মলা কি নির্ম্মল থাকৃতে পারবে? পারবে না—পারবে না! আর একটা কথা শোন, ডাক্তার!

নির্ম্মলা একদিন জ্বরের ঘোরে ভুল বকৃছিল। আমি মাঝে-মাঝে রোগশয্যা থেকে উঠে নির্ম্মলাকে দেখে আস্‌তুম। কিন্তু সেদিন গিয়ে কি শুনলুম জান? শুন্‌লুম, নির্ম্মলা সকাতরে বল্‌ছে, "ললিত! সেদিনের কথা ভুলে যাও—তুমি বিয়ে কর; তাহলেই আমি সুখী হব—"তারপর সে চুপিচুপি বিড়্‌বিড়্‌

করে আরো কি-সব বলতে লাগল, আমি শুনতে পেলুম না। কিন্তু যা শুনেছি তাই শুনেই ঘরের ভিতরে যেতে আমার পা উঠ্‌ল না; আচ্ছন্নের মত আপন ঘরে এসে বিছানার উপর আছ্‌ড়ে পড়লুম।

ডাক্তার, রোগের ঘোরেও সে ললিতকে ভোলে-নি! তাই কামনা করছিলুম, নির্ম্মলা মরুক্—আমি মরবার আগে নির্ম্মলা মরুক! রোগে যদি তার মৃত্যু হোত,—তাহলে আজ জীবন শূন্য হয়ে গেলেও হয়ত আমি পাগল হয়ে যেতুম না।

আজ দুদিন নির্ম্মলা কতকটা সাম্‌লে উঠেছে; কিন্তু ভয় যায় নি।

সেদিন বিকালবেলায় তার ঘরে গেলুম। ঢুকেই দেখি, নির্ম্মলা শুয়ে শুয়ে একখানা চিঠি পড়ছে। চিঠি পড়তে পড়তে সে এমনি তন্ময় হয়ে উঠেছিল যে, আমার পায়ের শব্দ মোটেই তার কানে ঢুক্‌ল না।

যখন একেবারে তার বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম, তখন সে মুখ তুলে আমাকে দেখেই চম্‌কে উঠল। তারপর, চিঠিখানা তাড়াতাড়ি কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে ফেল্‌লে।

দেখলুম, তার চোখের কানায়-কানায় জল টলমল করছে চিঠি পড়তে-পড়তে সে কাঁদছে!—কেন?

কুতুহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "কার চিঠি নির্ম্মল ?"

নির্ম্মলার মুখ পাঙ্গাশপানা হয়ে গেল। সে জবাব দিলে না।

আবার জিজ্ঞাসা করলুম, "কার চিঠি ?"

নির্ম্মলা নিরুত্তর।

বিরক্তস্বরে আমি বল্‌লুম, "বলবে না তাহলে ?"

নির্ম্মলা মুখ বুজে পাশ ফিরে শুয়ে রইল।

আর সইতে পারলুম না। রাগে কাঁপতে-কাঁপতে চড়া গলায় বল্লুম, "নির্ম্মলা, তুমি ঠাউরেচ কি, আমি কি তোমার গোলাম ? তুমি লুকিয়ে পরের সঙ্গে দেখা কর্‌বে—জ্বরের ঘোরেও পরপুরুষের নাম করবে—আড়ালে পরের চিঠি পড়বে, আমার বাড়ীতে বসে আমারই কথা মানবে না, শুনবে না,—আমার অসুখে কি তোমার ফূর্ত্তি বেড়েছে ? আমি না মরতে এই, ম'লে কি করবে ? তার চেয়ে তুমিও মর, আমিও মরে জুড়োই !"

নির্ম্মলা পাথরের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হয়ে শয্যায় পড়ে রইল।

—"এখনো বল বল্‌ছি, কার চিঠি ?"

নারীর এ কি স্পর্দ্ধা—তার এ নীরবতা অসহ্য !—আমার শিরায় শিরায় তপ্ত রক্ত ছুট্‌তে লাগল। সামনে একটা জলের কুঁজো ছিল, নিষ্ফল আক্রোশে সেটা তুলে নিয়ে দুম্ করে

মেঝেতে আছ্‌ড়ে ফেল্লুম, সেটা সশব্দে ভেঙ্গে একেবারে গুঁড়ো হয়ে গেল ; এক-টুক্‌রো ছিট্‌কে নির্ম্মলার গায়ের উপরেও গিয়ে পড়ল—তবু সে পাথরের মত নিসাড় নিথর হয়ে রইল,—কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করলে না।

কোনমতেই না-পেরে-উঠে ব্যঙ্গের হাসি হেসে শেষটা আমি তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠলাম,—"বোঝা গেছে, এ সেই লম্পট ললিতের চিঠি। তোমার বোন বিধবা হয়ে কুলত্যাগ করেছে, তোমার বোধ হয় অত দেরিও সইচে না ; স্বামী বেঁচে থাকতেই তুমি কুলে কালি দিতে চাও ! কুলটার বংশে তোমার জন্ম—তুমিও—"

ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত চকিতে সোজা হয়ে নির্ম্মলা দাঁড়িয়ে উঠল—তার মাথার রুক্ষ এলোমেল চুলগুলো ক্রুদ্ধ সাপের মত চারিদিকে ঠিক্‌রে-ঠিক্‌রে পড়ল—তার দুই চোখ স্থির বিদ্যুতের মত আমার চোখের উপর জ্বল্‌তে লাগ্‌ল—তার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত থরথর্‌ করে কাঁপতে লাগল ! কি-যেন সে বল্‌তে চায়—কিন্তু রাগের আবেগে তার কথা কণ্ঠের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে গেছে !

অনেক কষ্টে শেষটা সে এক নিশ্বাসে দৃপ্তস্বরে বলে উঠ্‌ল,—"কি ! কুলটার বংশে আমার জন্ম—আমি কুলটা !"

নির্ম্মলাকে বরাবর নেতিয়ে-পড়া লজ্জাবতী লতার মত

সঙ্কোচে জড়সড় দেখে আসছি,—আজ তার এ কি মূর্ত্তি—এ কি ভাব!—এ যে কখনো কল্পনাতেও ভাবতে পারি নি। মুহূর্ত্তে এমন পরিবর্ত্তন কি সম্ভব!

আমি আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে সে ঘর ছেড়ে চলে এলুম।

নিজের ঘরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়লুম। মাথার ভিতরে তখন সমস্ত ওলট্-পালট্ হয়ে গিয়েছিল। খানিকক্ষণ হতভম্বের মত চুপচাপ বসে রইলুম।

তারপর, সব ঘটনা মনে মনে একবার ভেবে নিলুম। নির্ম্মলার সুমুখ থেকে অমন করে পালিয়ে এলুম কেন? আমি কি কাপুরুষ! নির্ম্মলা দোষী হয়েও অনায়াসে আমাকে চোখ রাঙ্গালে—আর, আমি পালিয়ে এসে তার দেমাক্ বাড়িয়ে দিলুম! ছিঃ, ধিক আমাকে! পুরুষ হয়ে নারীকে—নিজের স্ত্রীকে ভয়! গলায় দড়ি আমার!

আপনাকে আপনি বারবার ধিক্কার দিতে লাগলুম। কিন্তু তাতেও মন উঠল না! আমি যে ভয় পাই নি, আমি যে স্ত্রৈণ নই, আমি যে ইচ্ছে কর্‌লেই নির্ম্মলাকে পায়ের নীচে থেঁৎলাতে পারি,—এটা তাকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে, এ-ঘর থেকেই আমি হো-হো করে তাচ্ছীল্যের উচ্চহাসি হেসে উঠ-

লুম। ও-ঘর থেকে নির্ম্মলা কি আমার হাসি শুনতে পায়-নি? পেয়েছিল বৈ কি!

সেই চিঠির কথা মনে পড়ল। কার চিঠি? নিশ্চয়ই ললিতের। নৈলে সে চিঠিখানা অমন করে লুকোত না। পাপী না হলে চিঠি দেখাতে তার অত ভয় কিসের? আমার সুকথা-কুকথা কিছুই সে গ্রাহ্য কর্‌লে না, চিঠিতে নিশ্চয়ই কোন দূষ্য কথা আছে।

হ্যাঁ—চিঠি পড়তে-পড়তে সে কাঁদছিল। আমার কড়াক্কড়িতে তার মনের ইচ্ছে পূর্ণ হচ্ছে না—সেইজন্যেই তার এ কান্না আর কি! কান্না ত দুর্ব্বলেরই বল!—আর, চিঠিখানা যে তার কত মনের মত হয়েছিল, তাও বেশ বুঝতে পাচ্ছি। আমার পায়ের শব্দও তার তন্ময়তা ভাঙ্গতে পারে-নি!

ললিত, ললিত, নির্ম্মলা তোমাকেই ভাবছিল! তোমাকে যদি এখন হাতের কাছে বাগে পাই, তবে নির্ম্মলার সামনে তোমাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে, এই দুই হাতে তোমার গলা টিপে ধরে, আস্তে আস্তে—ক্রমে ক্রমে—চেপে চেপে নিশ্বাস বন্ধ করে তোমাকে আমি খুন করে ফেলি! তোমাকে চোখের সামনে মরতে দেখে নির্ম্মলা কেঁদে উঠবে, আর তার কান্নার উত্তরে আমিও আকাশ ফাটিয়ে হেসে উঠ্‌ব, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

হঠাৎ আমার হুঁস হোল—এ কি! বিছানার একটা বালিশ দু-হাতে চেপে ধরে সত্যি-সত্যিই আমি যে বিকটস্বরে হাস্‌ছি! অ্যাঁঃ—আমি কি পাগল হলুম—এ আমি করছি কি?

গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। বাতাসের সঙ্গে যুঝে কোনই লাভ নেই। একটা কিছু করা চাই!

মরবার আগে আমাকে একটা কিনারা কর্‌তে হবেই হবে। সে দিনের স্বপ্ন আমি এখনো ভুলি-নি। কিছু-না-করে আমি যদি আজ মরি, তবে কাল সেই স্বপ্নই সত্য হবে।

কিন্তু কি কর্‌ব—কি কর্‌তে পারি?

একমনে ভাবতে লাগলুম—তেমন ভাবনা আর কখনো ভাবি নি।

ঝী এসে খবর দিলে, ডাক্তার-বাবুর লোক এসেছে। তাকে উপরে আনতে বল্‌লুম। যে এল সে ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার।

কম্পাউণ্ডার নির্ম্মলার জন্যে দুটো ওষুধ এনেছিল। সে বল্লে, "একটা খাবার, আর একটা বুকে মালিস করবার।"

শিশিদুটো দেখলুম। মালিশের ওষুধের শিশিতে এক-খানা কাগজে বড়-বড় ইংরেজী হরফে লেখা রয়েছে—"বিষ।"

শিশিটা একমনে দেখতে-দেখতে কম্পাউণ্ডারকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—“এ খেলে কি মানুষ মরে ?”

—“মরে বৈ কি !”

খানিক ভেবে আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, “যদি সমস্তটা খায় ?”

—“বারো ঘণ্টার মধ্যে মরে যেতে পারে ।”

—“আচ্ছা, যাও ।”

সেই রাত্রি—কালরাত্রি ! ওঃ, কে-যেন ধারাল ছুরি দিয়ে ছেঁদা করে সে রাত্রির সমস্ত অন্ধকার আমার বুকের মধ্যে পূরে দিয়েছে । সে রাত্রি কি ভুলব—ভুলতে কি পারি ?

ডাক্তার, সে-রকম রাতও কখনো দেখি নি,—তেমন ঘুটঘুটে অন্ধকারও আর-কখনো দেখি-নি ! খালি কি অন্ধকার ? যেমন ঝুপ্‌ঝুপ্‌ বৃষ্টি—তেমনি হুহু-হুহু ঝড় ! মড়মড় করে বড় বড় গাছের ডালগুলো ভেঙ্গে পড়ছে,—সেইসঙ্গে ক্রমাগত গুড়্‌গুড়্‌ করে বাজ ডাক্‌ছে আর ডাক্‌ছে ! সে রাতে পৃথিবীকে মনে হচ্ছিল, যেন সুধু শব্দের পৃথিবী !

এক-পা এক-পা করে নির্ম্মলার ঘরের দিকে গেলুম । ঘরে ঢুকবা-মাত্র লক্ষ্য করলুম—নির্ম্মলা চুপ করে উপরপানে চেয়ে শুয়েছিল, আমাকে দেখেই চোখ মুদলে । আমার উপর

তার এত ঘৃণা! মনে একটু যে ইতস্তত ভাব ছিল, নির্ম্মলার রকম দেখে তাও ঘুচে গেল।

খাটের পাশে গিয়ে ইচ্ছে করেই নীরস, কর্কশ স্বরে বললুম, "কেমন আছ?"

সে আমার দিকে পিছন ফিরে শুল। আমিও তখন তার ভালমানুষী চাইছিলুম না—সে রাগ করে, তাই আমার ইচ্ছা!

আমি তেমনি স্বরে বললুম, "আমার অসুখ শরীর, কখন্ আছি কখন্ নেই, এই দুর্য্যোগে বিছানা ছেড়ে উঠে, আমি এলুম তোমার কাছে—আর, তোমার কিনা এই ব্যবহার! যে রক্তে কমলিনী জন্মেছে, সেই রক্তেই ত তোমার জন্ম! স্বামীকে তুমি ভক্তি করবে কেন! আমি ত ললিত নই!"

এই কথাগুলো বলব বলে আমি আগে থাকতে অনেকক্ষণ ধরে মুখস্থ করে রেখেছিলুম।

নির্ম্মলা বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে, দুহাতে প্রাণপণে মাথার বালিশটা চেপে ধরলে,—যেন সে অনেক—অনেক কষ্টে আপনাকে সামলে নিচ্ছে!

আমি আবার বললুম, "তুমি অসতী! তোমার মৃত্যুই ভাল!"

নির্ম্মলা শিউরে উঠল।

“শোন, যা বল্‌তে এসেছি। মাথার উপরে যে শিশিটা রইল, ওটা বিষ। খেলেই লোক মরে যায়। ওটা বিষ—ভয়ানক বিষ, বুঝলে?”

কে এক পণ্ডিত বলেছিলেন, সঙ্গিন মুহূর্ত্তে কারুর মাথায় কোন কু-সঙ্কেত ঢুকিয়ে দিলে সেটা সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। সে-কথা আমি ভুলি-নি। আমি জানি, এইজন্যেই পৃথিবীতে অনেক মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেছে! এই মুহূর্ত্তে নির্ম্মলার আচ্ছন্ন দুর্ব্বল মস্তিষ্কের যে অবস্থা,—এখন কেমন করে কি ইঙ্গিত দিলে আমার কার্য্যোদ্ধার হবে,—আগে থাক্‌তে তার প্রত্যেক কথাটি তন্ন-তন্ন করে আমি ভেবে রেখেছিলুম।

ঠক্ করে নির্ম্মলার শিয়রে ওষুধের শিশিটা রেখে দিলুম। দেখলুম, শিশি রাখার শব্দে নির্ম্মলা চমকে উঠ্‌লো।

আস্তে-আস্তে দরজা পর্য্যন্ত এসে, ফিরে দাঁড়ালুম। তারপর, প্রত্যেক কথাটীতে খুব জোর দিয়ে-দিয়ে কর্কশস্বরে আবার বললুম,—“তুমি মলে আমি বাঁচি। কিন্তু বলে দিচ্ছি শোন, ওটা খাবার ওষুধ নয়, মারাত্মক বিষ। খেয়োনা যেন—ভয়ানক বিষ—খেলেই মরবে!”

নির্ম্মলার ঘর থেকে বেরুতেই,—কেন জানি না, আমার প্রাণে কেমন একটা আতঙ্ক হোল। ছুট্‌তে-ছুট্‌তে নিজের

ঘরে এসে ঢুকে পড়্লুম। তাড়াতাড়ি দড়াম্ করে দরজাটা এঁটে বন্ধ করে দিলুম।

ঘরের এককোণে জবুথবু হয়ে বসে বসে কাঁপছি আর কাঁপছি। এত কাপুনি কেনরে বাপু—শীত নেই, গা কাঁপে কেন? ভয়ে? ইঃ, ভয়টা কিসের—আমি কি কাপুরুষ? যার মরবার ভয় নেই, যে মরবে নিশ্চয়, যে মরতে প্রস্তুত, তার আবার কিসের ভয়—কাকে ডরায় সে? কিন্তু গা কেন তবু কাঁপে, বুকের কাছটা থেকে-থেকে কেন দুদ্দুর করে ওঠে?

ওকে—কে, ও!—ঐ যে নড়্ছে, আমার পাশে পাশে—নীরবে, নীরবে!—একলাফে দাঁড়িয়ে উঠলুম—সেও যে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল! হাঃ হাঃ, আরে দ্যুৎ! এ যে আমারি ছায়া!

দাও পিদিমটা নিবিয়ে,—ছায়া আর পড়্বে না!

উঃ, কি অন্ধকার—কি অন্ধকার! এত অন্ধকারও পৃথিবীতে ছিল? এ কি পৃথিবীর অন্ধকার,—না, নরকের? অন্ধকার যেন ঘুরুছে ফিরুছে, এগিয়ে আসছে, পিছিয়ে যাচ্ছে, জমাট হচ্ছে, তাল পাকাচ্ছে! ঐ যে শোঁ-শোঁ করে ঘরের মধ্যে কি এসে ঢুকে পড়ল, ও কি ঘরের হাঁক্, না অন্ধকারের দীর্ঘনিশ্বাস?

চুপ্—চুপ্! ঐ শোন, অন্ধকারে কে যেন যন্ত্রণায় কাত্রে কাত্রে কেঁদে উঠছে না? ঐ যে—ঐ যে! মাটীতে কাণ পেতে শোন—ও কান্না ঠিক তোমার বুকে এসে লাগছে না কি? কে যেন বলছে না কি "ওগো বুক গেল গো—ওগো বুক—উহু-হু-হু?"—হ্যাঁ, বলছে ত—বলছে ত! কৈ, না—কেউ ত কাঁদছে না—হ্যাঁ, কাঁদছে বৈকি,—না, না, কাঁদছে না—ও তোমার ভ্রম!

না—দেখে আসি, সত্যি হোক্ মিথ্যে হোক্—একবার দেখে আসি। এমন করে জড়ের মত এই অন্ধকারে হাত-পা গুটিয়ে কি বসে থাকা যায়?

এলমেল কতরকম ভাবনাই যে মাথার মধ্যে এল গেল—কে তার ঠিক রাখে?

আস্তে-আস্তে একবার উঠে দরজার কাছে এগিয়ে গেলুম। দরজায় হাত না দিতে সমস্ত ঘরখানা বিদ্যুতের তীব্র আলোয় দপ্ করে একবার জ্বলে উঠল। তারপর—বজ্রের সে কি ভয়ানক শব্দ! সে শব্দে বাড়ীখানার ভিত্ পর্য্যন্ত যেন টল্‌মল করে নড়ে উঠল—সঙ্গে-সঙ্গে ঝড়ের একটা প্রচণ্ড ঝাপটা দমাদম করে জানালা দুটো আচম্‌কা বন্ধ করে দিলে! কেমন-একটা ভয়ে আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল—আমার পিছনে-পিছনে, আমার সামনে-সামনে, আমার আশে-পাশে—যেদিকে

চাই সেইদিকে, যে দিকে যাই সেইদিকে—আকাশে বাতাসে ঝড়ে বৃষ্টিতে, বিদ্যুতের আলোয়, অন্ধকারের ভিতরে—কি-একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্ক যেন প্রলয়ঙ্কর মুর্ত্তিতে ফুটে উঠছে, ওৎ-পেতে, প্রকাণ্ড হাঁ করে হল্‌হলে জিভ বার করে, আমাকে গোগ্রাসে গিলে ফেল্‌তে চেষ্টা করছে;—খানিক হামাগুড়ি দিয়ে, খানিক দেয়াল হাত্‌ড়ে-হাত্‌ড়ে টল্‌তে-টল্‌তে পিছিয়ে এসে আমি বিছানার উপর এলিয়ে ধপাস্‌ করে পড়ে গেলুম।

সত্যিসত্যি মনে হোল, পাশের ঘরে কে যেন কাঁদছে, কে যেন যন্ত্রণায় ছটফট কর্‌ছে! সে কি কান্না—সে কি ছটফটানি! থেকে-থেকে আমি আঁৎকে আঁৎকে উঠতে লাগলুম! নিজের দেহকে যতটা পারি গুটিয়ে নিয়ে বিছানার চাদরখানায় সর্ব্বাঙ্গ মুড়ি দিয়ে, কুণ্ডলী পাকিয়ে বালিশে মুখ গুঁজড়ে পড়ে রৈলুম, দু হাতে প্রাণপণে দু কান চেপে ধরলুম, তবু সে কান্না থাম্‌ল না—থাম্‌ল না! আমি বিকৃতস্বরে চীৎকার করে উঠলুম,—"নির্ম্মল, নির্ম্মল! কেঁদনা—আর কেঁদনা—সত্যি বলছি তোমাকে ভালবাসি—তোমাকে ভালবাসি—তোমাকে ছেড়ে আমি থাক্‌তে পারব না—আমি ত মরবই—আজ না-হয় দুদিন পরে, তাই তোমাকে—তাই তোমাকে—"

নাঃ! তবু ত কান্না থামে না—একি সর্ব্বনেশে কান্না গো!

আর সহ্য কর্‌তে পার্‌লুম না—ধড়মড় ক’রে উঠে ছুটে গিয়ে জানালা খুলে দিলুম। বাইরে মুখ বাড়াতেই ঝড়ের অট্টহাস্যে সে কান্নার শব্দ কোথায় মিলিয়ে গেল—ঝর্ ঝর্ বৃষ্টির স্নিগ্ধ-শীতল জলধারায় আমার উত্তপ্ত শিরে যেন কার প্রশান্ত আশীর্ব্বাদ এসে পড়ল।

সেইভাবে চোখ মুদে দাঁড়িয়ে রইলুম—কতক্ষণ, কে-জানে! যখন চোখ চাইলুম, তখন প্রাতঃসন্ধ্যার কোমল ছায়ালোকে নিদ্রোত্থিত পৃথিবী পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

কালকের রাতের ঘটনা স্বপ্ন বলে মনে হতে লাগল। কিন্তু, সে স্বপ্ন কি কঠোর সত্য!

আমার দেহ রুগ্ন বটে, কিন্তু মনের উত্তেজনায় রোগের কোন লক্ষণ বুঝতে পাচ্ছিলুম না। এককথাই একশোবার মনে হচ্ছিল, নির্ম্মলা কি আমার ইঙ্গিত বুঝতে পেরেছে? সে কি সেই শিশির ওষুধ——

দু-তিনবার ঘর থেকে বেরুতে গেলুম,—কিন্তু পা উঠল না। কে জানে গিয়ে কি দেখব?——তাই যদি সত্যিসত্যিই ঘটে থাকে, তবে সে দৃশ্য প্রাণ ধরে দেখতে পারব কি? সেই চিকণ রেশমী চুল,—ঘাড়ের উপর কপালের উপর যা এঁকে-বেঁকে কুঁকড়ে থাকৃত, সেই দুটি বড়-বড় টানা-টানা চোখ,—

আমার চুম্বনে যারা আবেশে কাঁপতে কাঁপতে পদ্মকোরকের মত মুদে থাক্ত, সেই দুটি কপোল—আমার স্পর্শে যাতে ধীরে ধীরে গোলাপের রং ফুটে উঠ্ত,—সেই রূপের কুসুম যদি স্বর্গচ্যুত পারিজাতের মত পরিম্লান হয়ে গিয়ে থাকে—আমি কি তবে তা দেখ্তে পার্ব—পাষাণে বুক বেঁধে, শুষ্কনেত্রে, স্থিরভাবে?

কিন্তু, দেখতেই হবে—দেখতেই হবে! আমার এ লক্ষ্মীশূন্য সংসারে আমাকে ত আর বেশীদিন জ্বালা পোহাতে হবে না। আমি আর কতদিন? তবে ভয় কি?

ঝি-বামুন তখনো আসে-নি, কোথাও জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। আমার বাড়ীখানা যেন হানাবাড়ীর মত ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধ হয়ে আছে! সাহসে ভর করে নির্ম্মলার ঘরে গিয়ে ঢুক্লুম।

প্রথমেই চোখ পড়ল খাটের উপরকার তাকের দিকে। মালিশের শিশিটা সেখানে নেই!

খুব-জোরে দরজায় ঠেশ-দিয়ে দাঁড়ালুম—নইলে মাথা ঘুরে পড়ে যেতুম। বুকের ভিতরটা দুপদুপ্ কর্ছিল—সে দুপদুপুনি বন্ধ কর্তে দু-হাতে বুকের কাছটা চেপে ধর্লুম—কিন্তু সে আওয়াজ থাম্ল না।

বিছানার চাদরে মাথা থেকে হাঁটু পর্য্যন্ত ঢেকে, মেঝের উপরে স্থির হয়ে শুয়ে আছে—কে সে? নির্ম্মলা! তার আর-

কিছু দেখতে পেলুম না—কেবল পা-দুটি ছাড়া। ওঃ! এই কি সেই নির্ম্মলার পা? রক্তহীন—কালিমালিপ্ত আড়ষ্ট,—আঙ্গুলগুলো শিঠিয়ে সামনের দিকে বেঁকে-বেঁকে দুম্‌ড়ে পড়েছে!

প্রাণ শিউরে উঠল—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলুম।

যা দেখেছি, যথেষ্ট! চাদর খুলে ও মুখ কে দেখ্‌বে?—আমি? পারব-না—পারব না! এত ভয়ানক,—মৃত্যু?—কে জানত!

মেঝের উপরে একখানা কাগজ পড়ে রয়েছে না? হ্যাঁ—নিশ্চয় সেই চিঠি! এ চিঠি এতক্ষণ প্রাণপণে যে আগ্‌লে ছিল, সে এখন কোথায়? তার প্রেতাত্মা কি ঘরের এক-পাশে মলিনমুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এখনো আমার কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করছে?

ভয়ে-ভয়ে গুড়ি মেরে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে চিঠিখানা তুলে নিলুম। ও কি ও! নির্ম্মলার গায়ের চাদরখানা নড়ে কেন? আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল, মাথার চুলগুলো যেন মাথার উপর খাড়া হয়ে উঠল! বিস্ফারিত নেত্রে স্পষ্ট দেখলুম, চাদরের একপাশ জোরে জোরে নড়্‌ছে—ভিতরে কি-যেন ঠেলে-ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে!

বিকটস্বরে চীৎকার করে উঠলাম—চাদরের ভিতর থেকে

নির্ম্মলার পোষা বেড়ালটা বেরিয়ে এসেই একছুটে পালিয়ে গেল। আঃ—রক্ষা পাই! কিন্তু, তবু আমার গা-ছমছমানি ভয় ঘুচল না—বেড়ালটার সঙ্গে সঙ্গে আমিও একদৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লুম।

নিজের ঘরে এসে অনেকক্ষণ পরে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হোল। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, এক গেলাস জল খেলুম। খানিকক্ষণ ঘরের মেঝেতে পাইচারি করলুম। তার পর, সেই চিঠিতে কি আছে, তাই জানবার আগ্রহ হোল।

চিঠিখানা চোখের সামনে ধরলুম। প্রথমেই হাতের লেখা দেখে মন চম্‌কে উঠ্‌ল। এ কি, এ ত পুরুষের লেখা নয়!

"শ্রীচরণেষু,

দিদি, বড় লজ্জায়, মুখ পুড়িয়ে তোমাকে এই চিঠি লিখছি। সংসারে তুমি বৈ এ পোড়ারমুখীর আপন বল্‌তে আর কে আছে? দিদি, যার কথায় ভুলে ধর্ম্ম ছেড়েছি, কুলে কালি দিয়েছি, সে এখন আমায় পথে বসিয়ে কোথায় পালিয়েছে। আমি এখন খেতে পাচ্ছি না; এ সময় তুমি যদি কিছু দাও, তবেই প্রাণে বাঁচব। আর কি লিখ্‌ব। উপরে ঠিকানা দিলুম।

অভাগিনী "কমলিনী।"

চিঠি পড়ে বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলুম।

কমলিনীর পত্র! নির্ম্মলা তাই আমাকে এ চিঠি দেখায় নি! তাই সে কাঁদছিল! আর আমি—আর আমি—

এতক্ষণ স্থির হয়ে ছিলুম, আর পারলুম না। মেঝেতে কপাল ঠুকতে-ঠুকতে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলুম।

ডাক্তার! এই আমার কথা। আমি যে কি পাষণ্ড, তা কি বুঝতে পারছ? আমার মতন আশ্চর্য্য ও অস্বাভাবিক মানুষ তুমি কি আর কখনো দেখেছ?

কিন্তু সবুর কর, এখনো একটু বাকি আছে। সে ঘটনার পরের কথা আমি তোমাকে কিছুতেই বল্‌তে পারব না; সুতরাং কি ফল সে বিফল চেষ্টায়? তবে, আমার নিজের কথাই আরো কিছু বল্‌ব। মাঝখানে বাদ দেওয়াতে যদি কোথাও খাপ্‌ছাড়া বোধ হয়, তবে সেটুকু তুমি নিজেই পুরিয়ে নিও।

আমি শ্মশানে যাই নি—যেতে পারি-নি। গাঁয়ের লোকেরাই এসে নির্ম্মলাকে শ্মশানে নিয়ে গেল। তারা জান্‌লে, নির্ম্মলা ভুল করে মালিশের ওষুধটা খেয়ে ফেলাতে, এই বিপত্তি ঘটেছে। নির্ম্মলা মরে গিয়েও নাকি শিশিটা হাত থেকে ছাড়ে-নি, সেটা তার মুঠোর মধ্যেই পাওয়া গিয়েছিল। আহা,

ছাড়বে কেন,—সেই শিশিই যে তাকে আমার কবল থেকে মুক্তি দিয়েছে!

খবর পেয়ে ললিতও এসেছিল। নির্মলার ঘর থেকে যখন বেরিয়ে এল, সে তখন কাঁদছিল। তার উপর আর আমার রাগ ছিল না। তার কান্নায় আমারও কান্না এল।

আমি কাঁদছি দেখে চোখের জল মুছে সে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। আমাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

আমি বললুম, "ললিত বাবু শুনেছি আপনি মস্ত ডাক্তার। একটা কথা রাখবেন কি?"

—"বলুন।"

—"আপনি ঠিক বলবেন—লুকোবেন না?"

—"কি কথা আগে শুনি।"

—"আমার যক্ষ্মা হয়েছে, জানেন ত?"

—"শুনেছি বটে।"

—"হ্যাঁ, আমার যক্ষ্মা হয়েছে। আপনি আমাকে একবার পরীক্ষা করে ঠিক বলুন দেখি, কত শীঘ্র আমি মরব। আপনার পায়ে পড়ছি, কিছু লুকোবেন না। মরণে আমার ভয় নেই।"

ললিত একটু কুণ্ঠিত হয়ে বললে, "মাপ করবেন—এতে

পায়ে পড়াপড়ির কি আছে ? যখন জানতে চাইছেন, কিছুই লুকোবো না।”

ললিত খুব মন দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নানারূপে পরীক্ষা করলে। তারপর বললে, “আমার যতদূর বিদ্যা, তাতে বল্‌তে পারি, আপনার একেবারেই যক্ষ্মারোগ হয়-নি।

—অ্যাঁ, ঠিক বলছেন ?”

—“হ্যাঁ।”

আমি দুহাতে ললিতের হাত জড়িয়ে ধরে কাতরস্বরে বল্‌লুম,—“বলুন—বলুন, লুকোবেন না। আমার যক্ষ্মা হয়-নি, বলেন কি ?”

আমার রকম দেখে ললিত আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে,—“আমি ঠিক বল্‌ছি, কিছুই লুকোই-নি। আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন।”

আমার নির্ম্মল!—আমার নির্ম্মল।—এই আলোয়-ভরা পৃথিবী আমার চোখে একলহমায় আঁধার-ঢাকা হয়ে গেল! দু-চোখ মুদে যেন দেখলুম, সেই গভীর অন্ধকার ভেদ করে বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল একখানি মুখ জেগে উঠল—চোখে সেই মধুর লজ্জা, ঠোঁটে সেই মৃদু হাসি, মুখে সেই স্বর্গের শ্রী—সে যে তারই মুখ! চকিতে সে মুখ কোথায় লুকিয়ে গেল,—তারপরেই আবার কি ও জেগে উঠল!—ও যে

সেই পা-দুখানা;—সেই আড়ষ্ট, রক্তহীন, আঙ্গুল-দুমড়ানো পা-দুখানা!

ভয়বিভোর চোখে সেই বিকৃত পা-দুখানা দেখতে দেখতে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লুম।

যখন জ্ঞান হোল—দেখলুম, স্মৃতির শ্মশানে আমি পরিত্যক্ত, উন্মত্ত, জীবন্মৃত!

ডাক্তার! না, আর থাক্—"

* * * *

এই অপূর্ব্ব পাগলের বিচিত্র কাহিনী-পড়া সাঙ্গ হইল। মনটা কেমন ভারগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিলাম, "চল, চল, তোমার এ গারদ থেকে বেরিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি!"

শচীশের সঙ্গে বাহিরে আসিলাম। ফটকের দিকে যাইতে যাইতে পথে সেই পাগলের ঘর পড়িল।

সেদিকে তাকাইতেই দেখি, আকাশের দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া সেই পাগল স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পাণ্ডুর মুখে সূর্য্যের কিরণ লাগাতে গালের উঁচু-উঁচু হাড়দুখানা যেন আরও-বেশী বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

হঠাৎ শচীশকে দেখিয়া পাগল ডাকিল, "ডাক্তার, ডাক্তার!"

শচীশ তার কাছে গেল।

হাত বাড়াইয়া পাগল কহিল, "হাতটা দেখুন ত একবার!"

শচীশ তার হাত ও বুক পরীক্ষা করিয়া বলিল, "তাইত, আপনার যে যক্ষ্মা হয়েছে!"

ম্লান হাসি হাসিয়া পাগল বলিল, "আঃ, বাঁচলুম!"

শচীশ আমার কাছে আসিয়া নিম্ন স্বরে বলিল, "যখন ভাল থাকে, তখনো এর এই পাগলামি-টুকু ঘোচে না।"

কুসুম

ক

সে পতিতা। জীবনের ক্ষণিক ভ্রমেতে নয়,—বিধাতার বিধানে সে পতিতা।

পঙ্কের ভিতরে পদ্মের মতই কুসুম ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

* * * * *

ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিয়া উঠিবার আগেই, পথের ধারের বারান্দায় কুসুম তাহার রূপের প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া বসিয়া থাকিত। তাহার প্রাণ তখন কাঁদিত, মুখ হাসিত!

রাস্তার লোকগুলা যেন 'উর্দ্ধমুণ্ড' ব্রত গ্রহণ করিয়াছে,—সকলের চোক তাহার উপরে! তাহাদের সেই নিষ্ঠুর, ক্ষুধিত, ও ঘৃণিত দৃষ্টির মাঝে কুসুম, বিশ্বের নারী-জাতির প্রতি মৌন ধিক্কারকে ফুটিয়া উঠিতে দেখিতে পাইত।

রাস্তায় গাড়ীর পর গাড়ী ছুটিতেছে। এক-একখানা গাড়ীর খড়খড়ি-কপাট সব তোলা। কিন্তু কুসুম দেখিত, খড়খড়ির ফাঁকে ফাঁকে কুললক্ষ্মীদের কৌতুহলী দৃষ্টি বাহিরের

মুক্ত আলোর দিকে একাগ্র হইয়া আছে। সে দৃষ্টি কুসুমের উপর পড়িলেই সচকিত হইয়া উঠিত। কুসুমের মনে হইত, সে পবিত্র নয়নের নির্ম্মল দৃষ্টি যেন বিদ্যুতাগ্নির মত তার দেহ-মনকে ঝল্‌সাইয়া দিয়া যাইতেছে। মরমে মরিয়া কুসুম, বারান্দার রেলিঙ্গে মাথা রাখিয়া বসিয়া থাকিত। দেহের ভিতর হইতে তাহার নারী-প্রাণ যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিত, "এ রূপের প্রদীপ নিবিয়ে দাও,—ওগো কঙ্কালের বাঁধন খুলে দাও!"

খ

বারান্দা হইতে কুসুম সেদিন উৎকণ্ঠিত হইয়া দেখিল, ট্রামগাড়ী থেকে নাবিতে গিয়া একটি ভদ্রলোক পা ফস্কাইয়া রাস্তার উপরে পড়িয়া গেলেন। গাড়ীসুদ্ধ লোক হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল,—কিন্তু গাড়ী না থামাইয়া চালক আরও জোরে গাড়ী চালাইয়া দিল।

পাথরে মাথা ঠুকিয়া বৃদ্ধ একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চারিপাশে ক্রমেই লোক জড় হইতে লাগিল।

একজন বলিল, "ওহে, মাথা দিয়ে রক্ত পড়্‌চে যে!"

আর একজন বলিল, "মরে যায় নি ত?"

আর একজন বলিল, "উঁহু!"

আর একজন বলিল, "মরেনি, কিন্তু মর্‌তে কতক্ষণ!

চলহে, এখন পুলিশ-টুলিশ এসে পড়বে, আর সাক্ষী মেনে থানায় ধরে নিয়ে যাবে!"

বারান্দার উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া আকুল-চোখে কুসুম দেখিল, সবাই গোলমালই করিতেছে, বৃদ্ধকে সাহায্য করা কাহারও ইচ্ছা নয়!"

কুসুম আর স্থির থাকিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি উপর হইতে নামিয়া আসিল।

ভিড় ঠেলিয়া সে ভিতরে গেল। অচেতন বৃদ্ধের দিকে একবার চাহিয়া, কুসুম বলিল, "আপনারা এঁকে দয়া করে আমার ঘরে তুলে দিয়ে আসবেন? নৈলে ইনি মারা যাবেন।"

তিন-চারজন লোক ছুটিয়া আসিল।

ভিড়ের ভিতরে ফিস্‌ফিস্ করিয়া একজন বলিল, "বুড়োটা এর কে রে?"

আর একজন বলিল, "হেঁঃ! তা আর বুঝ্‌তে পারচ না ম্যাড়াকান্ত?"—সে একটা অর্থপূর্ণ ঈশারা করিল। অনেকেই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কুসুম সে সব কাণেও তুলিল না। চোখ নামাইয়া সে মাটির দিকে তাকাইয়া রহিল।

চারজন লোকে ধরাধরি করিয়া বৃদ্ধকে তুলিয়া ধরিল। তখনও তাঁর জ্ঞান হয় নাই; মাথায় রক্তপড়াও বন্ধ হয় নাই।

তাঁর মুখ একদিকে হেলিয়া আছে,—হাত দুখানি অসহায়-ভাবে দুদিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। কুসুম আস্তে আস্তে হাতদুটি আবার বৃদ্ধের বুকের উপরে তুলিয়া দিল।

পিছন হইতে কে-একটা অসভ্য উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "যত্ন কর্‌বার এমন মনের মানুষ পেলে আমিও বাবা, দিনে দুশোবার ট্রাম থেকে পড়ে যেতে রাজী আছি !"

গ

একরাত একদিন গিয়াছে,—বৃদ্ধ তেমনি অজ্ঞান।

কুসুম একরকম খাওয়া-দাওয়া ভুলিয়া তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতেছে।

সে নিজের কাপড় ছিঁড়িয়া বৃদ্ধের ক্ষতস্থানে বাঁধিয়া দিয়াছে ; রাতভোর জাগিয়া, বিছানার পাশে বসিয়া তাঁকে পাখার হাওয়া করিয়াছে। বাড়ীর তলায় একজন ডাক্তার থাকিত, কুসুম তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়াছিল।

কিন্তু সকাল গেল, বিকাল গেল—কৈ, রোগীত এখনো চোখ মেলিয়া চাহিলেন না ! কুসুম ভাবনায় পড়িল।

সন্ধ্যার সময়ে বৃদ্ধের গায়ে হাত দিয়া কুসুম দেখিল, গা যেন আগুন !

ভয় পাইয়া তখনি সে চাকরকে একজন নামজাদা ডাক্তার ডাকিয়া আনিতে বলিল।

ডাক্তার আসিল। সে বয়সে যুবক,—সবে বিলাত হইতে ফিরিয়াছে।

পরীক্ষার পর ডাক্তার বলিল, "এঁর অবস্থা বড় ভাল নয়।"

কুসুম কাতরে বলিল, "তবে কি হবে?"

"ভাল করে চিকিৎসা হলে, বিশেষ কোন ভয় নেই।"

রোগীর মাথায় 'ব্যাণ্ডেজ' বাঁধিয়া ও 'প্রেস্‌ক্রিপসন্' লিখিয়া ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইল।

কুসুম ডাক্তারের হাতে 'ভিজিটে'র টাকা কটা গুঁজিয়া দিল।

আঙ্গুল দিয়া টাকাগুলি অনুভব করিতে করিতে কুসুমের দিকে চাহিয়া ডাক্তার বলিল, "ইনি তোমার কে?"

কুসুম কি উত্তর দিবে ভাবিতেছে, কিন্তু তার আগেই ডাক্তার আবার বলিল, "ইনি বুঝি—"

ডাক্তার কি বলিবে, সেটা আগে থাকিতেই আন্দাজ করিয়া তাহার কথা শেষ না-হইতে-হইতেই কুসুম সবেগে মাথা-নাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "না, না, না!"

"তবে?"

কুসুম অল্প দু-চার কথায় সব বুঝাইয়া দিল।

ডাক্তার খানিকক্ষণ কি ভাবিল। তার পর বলিল, "দেখ,

তুমি এক কাজ কর। এঁকে কাল সকালেই হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও। সেখানে ভাল চিকিৎসাও হবে, আর হঠাৎ কিছু হলে তোমারও কোন দায়দোষ থাকবে না।”

দরজার কাছে দাঁড়াইয়া এক প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক ডাক্তারের কথা একমনে শুনিতেছিল। এখন, হঠাৎ সে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া বলিল, “আমিও তাই বলি ডাক্তার-বাবু! দ্যাখদিকিন্, কোথাকার আপদ কার ঘাড়ে এসে পড়্‌ল! ও ছুঁড়ীর মতিচ্ছন্ন হয়েছে,—আমার কথাতে কিছুতেই ও কাণ পাত্‌বে না। আপনাদের পাঁচজনের দয়ায় কোনরকমে দুটাকা-পাঁচটাকা ঘরে আসে, তা ও হ্যানরে ত্যানরে, রুগীরে, ডাক্তার রে, ওষুধ রে, পত্তি রে,—ভালমানুষের ওসব কি পোষায়, না ভাল খাবায়? তা তুই—”

কোনরকম উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া আপন মনে সে গড়্‌গড় করিয়া বলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু কুসুম অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, “মা তুই থাম্ বল্‌চি!”

“থাম্‌ব? কেন থাম্‌ব? হক্ কথা বল্‌ব, তা—”

“ফের্ যদি ফ্যাচ্-ফ্যাচ্ কর্‌বি মা, তাহলে এই ঘটি দিয়ে—” বলিতে বলিতে কুসুম জলের ঘটির দিকে হাত বাড়াইল।

কুসুমের মা ভয় পাইয়া ঘর থেকে বাহির হইয়া নীচে নামিয়া গেল; এবং সেখান হইতে অকথ্য ভাষায় মেয়েকে গালি পাড়িতে লাগিল।

সেদিকে কাণ না পাতিয়া কুসুম, ডাক্তারকে বলিল, "এঁর জ্ঞান হবে কখন?"

ডাক্তার এতক্ষণ চুপ্‌টি করিয়া কি-এক চোখে কুসুমের দিকে চাহিয়া ছিল। তাহার প্রশ্ন শুনিয়া বলিল, "আজ রাত্রেই জ্ঞান হতে পারে। তবে, বলাও যায় না",—তারপর হাত বাড়াইয়া বিছানার উপর হইতে টুপীটা তুলিয়া লইয়া বলিল, "তবে, আমি এখন চল্লুম।"

"আসুন,"—কুসুম ডাক্তারকে নমস্কার করিল।

যাইতে যাইতে হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া ডাক্তার বলিল, "দেখ, তোমার 'ভিজিটে'র টাকা ফিরিয়ে নাও।"

কুসুম, বিস্মিতস্বরে বলিল, "কেন?"

ডাক্তার স্নিগ্ধচোখে কুসুমের চকিত চোখের দিকে চাহিয়া, শুধু বলিল, "না।"

কুসুম অত্যন্ত সন্দেহ ও বিরক্তির সহিত কহিল, "কেন নেবেন না, বলুন আপনি!"

কুসুমের মনের ভাব বুঝিয়া ডাক্তার মুখ টিপিয়া নীরব-হাস্য করিল। তারপর হাতের টাকাগুলো ঝন্‌ঝন্‌-শব্দে

বিছানার উপরে ছুঁড়িয়া দিয়া, জুতা মস্‌মস্‌ করিতে করিতে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

কুসুম খানিকটা ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আপনমনে অস্ফুট ও দুঃখিত কণ্ঠে বলিল, "এমন পোড়া মন নিয়ে সংসারে এসেছি যে, সাধুকেও সন্দেহ হয়!"

ঘ

অনেক রাতে রোগীর জ্ঞান হইল।

পাশ ফিরিয়া, থামিয়া থামিয়া তিনি বলিলেন, "বুক জ্বলে যাচ্ছে—একটু জল।"

পাখার বাতাস করিতে করিতে তখন কুসুমের সবে একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। রোগীর গলা শুনিয়া ধড়্‌মড়্‌ করিয়া সে উঠিয়া বসিল। তাড়াতাড়ি কুঁজো হইতে একটা কাঁচের গেলাসে জল গড়াইয়া সে রোগীর মুখের কাছে ধরিল।

জলপান করিয়া রোগী আরাম পাইলেন। কুসুম তাঁহার তপ্ত কপালে আপনার ঠাণ্ডা হাতদুখানি আল্‌তভাবে বুলাইয়া দিতে লাগিল।

"ওঃ! বুক জ্বলে যাচ্ছে, বুক জ্বলে যাচ্ছে!

কুসুম তখনি রোগীর বুকে হাত বুলাইতে লাগিল। তিনি "আঃ" বলিয়া চোখ বুজিলেন।

খানিক পরে আবার তাঁহার তৃষ্ণা পাইল। কুসুম আবার জল দিল।

রোগী খানিকক্ষণ ঝিমন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, তারপর একবার জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "কে? মা সুধা?"

মুখ ফিরাইয়া কুসুম বলিল, "না, না! আমি পোড়াকপালী!"

রোগী চোখ মুদিয়া আপনা-আপনি বলিলেন, "এত রাত অবধি জেগে আছিস্ মা!"

মা! সে কি কথা, সে কি স্বর!—কুসুমের সারা বুক ভরিয়া উঠিল। খাটের পরে মাথা রাখিয়া সে একমনে, সেই স্বর আপন মনের মধ্যে উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া শুনিতে লাগিল।

তার বোধ হইল, সে যেন এই বিপন্ন বৃদ্ধের আপন কন্যা! বাবা যে কেমন, কুসুম ত একথা কখনই জানে নাই,—আজ যেন তারই একটা অজানা আনন্দের আভাস প্রাণে তার জাগিয়া উঠিল।

হঠাৎ ঘরের দরজায় বাহির হইতে করাঘাত হইল।

কে ডাকিল, "কুসুম!"

কুসুম শুনিয়াও শুনিল না। সে তখনও বুঝি মা-ডাক্ শুনিতেছে!

"কুসুম!—অ আমার কুসুমকলি!"

কুসুম চুপ।

"ও কুসুম, শুন্‌চ ?'—সঙ্গে-সঙ্গে আগন্তুক বাজ্‌খাই গলায় একটা গান ধরিয়া বসিল। সে ত গান নয়—যেন ষাঁড়ের ডাক্‌!

এবারে কুসুমের মনে ভারি ভয় হইতে লাগিল,—রোগী যদি শুনিতে পান ?

"(হঠাৎ গান থামাইয়া) ওগো কুসুম,—ও—" কিন্তু কথা শেষ হইতে না হইতেই হঠাৎ নীরবে দরজাটা খুলিয়া গেল এবং বিদ্যুতের মত বাহিরে মুখ বাড়াইয়া নিম্ন অথচ তীব্রস্বরে কুসুম বলিল, "ফের্‌ যদি কুসুম কুসুম কর্‌বে, তাহ'লে ঝাঁটা মেরে বিষ ঝেড়ে দেব। বেরোও এখান থেকে—।

যেমন সহসা দরজাটা খুলিয়াছিল তেমনি সহসা আবার বন্ধ হইয়া গেল।

৬

পরদিনের সন্ধ্যাবেলা। কুসুম জানালার কাছে একলাটি বসিয়াছিল।

আজ সকালে রোগীর জ্বর হঠাৎ বাড়িয়া উঠাতে কুসুম ভয় পাইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও রোগীকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিয়াছে। না দিয়া আর উপায় কি ?

আপন জীবনের মলিনতা, কুসুমকে সব-সময়েই কাতর করিয়া রাখিত। এই মলিনতার ভিতরে থাকিয়াও, সে যে

একটা ভাল কাজ করিতে পারিয়াছে, এটা ভাবিয়াও মন তার সন্তোষ ও পুলকে পূরিয়া উঠিতেছিল।

আর, রোগীর উপরে তার কেমন একটা মায়াও পড়িয়া গিয়াছিল। রোগীর সেই রোগকাতর মুখখানি এখনও তার প্রাণের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারিতেছিল।

দিনের ভিতরে চার-পাঁচবার চাকর পাঠাইয়া কুসুম রোগীর খবর লইয়াছে। জানিয়াছে যে, রোগীর বাড়ীর লোকেরা কেমন করিয়া সংবাদ পাইয়া হাসপাতালে আসিয়াছে।

* * *

তিন-চারদিন পরে শুনিল, রোগীর জ্বর বন্ধ হইয়াছে, কাল তিনি নিজের বাড়ীতে ফিরিবেন।

একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কুসুম ভগবানকে ধন্যবাদ দিল। ঠিক করিল আজই সে রোগীকে একবার দেখিতে যাইবে।

চ

হাসপাতালের সুমুখে আসিয়া কুসুম গাড়ী হইতে নামিল। ফুলদার রেশমী চাদরখানি মাথার উপরে টানিয়া দিয়া চাকরের সঙ্গে চলিল। চাকর তাহাকে রোগীর ঘর চিনাইয়া দিল। আস্তে আস্তে দরজা ঠেলিয়া কুসুম ভিতরে ঢুকিল।

একটি বালিসে ঠেসান্ দিয়া বৃদ্ধ বসিয়া আছেন। পাশে

একটি যুবক ও একটি বয়স্কা রমণী। বৃদ্ধ কি কথা কহিতেছিলেন,—হঠাৎ কুসুমকে ঢুকিতে দেখিয়া বলিতে বলিতে থামিয়া গেলেন।

কুসুম সঙ্কুচিতভাবে আগাইয়া গিয়া বৃদ্ধের পায়ে মাথা ছোঁয়াইয়া ভক্তিমতী কন্যার মত প্রণাম করিল।

কুসুমের দিকে চাহিয়া বিস্মিত বৃদ্ধ বলিলেন, "কে গা তুমি?"

কুসুম মৃদুস্বরে বলিল, "আমাকে চিনতে পার্‌ছেন না বাবা?"

ভাল করিয়া কুসুমের মুখ দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধ বলিলেন, "হুঁ, চিনি চিনি কর্‌চি বটে! বোধ হয়—বোধ হয়, অসুখের সময়ে তোমাকে কোথায় দেখেচি। তাই নয় কি?"

কুসুম ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

"রোসো—রোসো, মনে পড়েচে। তুমি কি আমার পায়ে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলে, আমাকে জল খেতে দিয়েছিলে?"

"ট্রাম থেকে পড়ে গেলে পর আপনাকে আমি আমার ঘরে তুলে নিয়ে গিয়েছিলাম। আপনি আমার বাড়ীতে দু' রাত ছিলেন। তারপর আপনার জ্বর বেড়ে ওঠাতে আমি ভয় পেয়ে আপনাকে এখানে পাঠিয়ে দি। আপনি ভাল আছেন শুনে একবার দেখে যেতে এসেচি।"

বৃদ্ধ মুখ নীচু করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। তারপর, কুসুমের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একবার খরচোখে দেখিয়া লইয়া চিন্তিতভাবে বলিলেন, "তোমার ঘরে, তোমার হাতে আমি জল খেয়েচি,—বল কি, অ্যাঁ!"

বৃদ্ধের ভাব দেখিয়া কুসুম একেবারে থ হইয়া গেল।

তীব্রস্বরে বৃদ্ধ বলিলেন "হ্যাঁ—হ্যাঁ, আরও মনে পড়্‌চে। তুমি আমাকে দুধ আর সাবুও খেতে দিয়েছিলে।"

একটু থামিয়া হঠাৎ বিছানার উপরে সোজা হইয়া বসিয়া, উগ্রকণ্ঠে তিনি আবার বলিয়া উঠিলেন, "গণিকা তুই,—জানিস্, আমি ব্রাহ্মণ!"

কুসুমের মাথা হেঁট হইয়া গেল।

"আমার জাত মেরেচিস্! তার চেয়ে আমি মরে গেলাম না কেন, আমি মরে গেলাম না কেন!—পাপিষ্ঠা, আবার কি করতে এখানে এসেচিস্ তুই?"

কুসুম কিছু বলিতে পারিল না। আড়ষ্ট ও জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বৃদ্ধ কর্কশস্বরে বলিলেন, "কথা ক'! বল্, কি চাস্ তুই? বখ্‌শিষ্?"

বখ্‌শিষ্!—কুসুমকে ঠিক যেন কে একটা ধাক্কা মারিল। গর্ব্বিতভাবে হঠাৎ মাথা তুলিয়া দৃঢ়স্বরে সে বলিল, "হাঁ!"

বালিশের তলা থেকে একখানা দশটাকার নোট বাহির করিয়া বৃদ্ধ অবজ্ঞাভরে কুসুমের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। নোটখানা কুসুমের গায়ে লাগিয়া মাটিতে প'ড়িয়া গেল।

কুসুম হেঁট হইয়া নোটখানা তুলিয়া লইল। তারপর কোন দিকে না চাহিয়া নতমুখে দৃঢ়পদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

কুসুম, রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল।

একটা খোঁড়া ভিখারী হাত পাতিয়া বলিল, "মা কিছু ভিক্ষে দাও মা!"

কুসুম অত্যন্ত তাড়াতাড়ি নোটখানা ভিখারীর হাতে গুঁজিয়া দিল।

ভিখারী প্রথমটা হতভম্ব হইয়া গেল। তারপর কুসুমের পায়ের তলায় পড়িয়া গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে বলিল, "জয় হোক্ রাজা মা,—জয় হোক্!"

কিন্তু সে জয়ধ্বনি কুসুমের কাণে প্রবেশ করিল না। বধির হইয়া সে রৌদ্রদীপ্ত আকাশের অনন্ত নীলিমার দিকে চাহিল,—হায়, তাহার অশ্রু-অন্ধ চোখে বিশ্ব আজ অন্ধকার—অন্ধকার!

দেবী

ক

ডেপুটিগিরির সচল পদ পাইয়া বাঙ্গালাময় চলিয়া বেড়াইতেছিলাম। সংপ্রতি ছ' মাসের ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিয়া কিছুদিনের জন্য চলা বন্ধ করিয়া অচল হইয়া বসিয়াছি।

বাড়ীর সাম্‌নেকার রোয়াকে বসিয়া সেদিন খবরের কাগজ পড়িতেছিলাম। হঠাৎ মুখ তুলিয়া দেখি, আমার দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া একটা লোক চুপ করিয়া রাস্তার উপরে দাঁড়াইয়া আছে।

আমার চোখ তাহার চোখে মিলিবামাত্র সে থতমত খাইয়া মুখ নীচু করিয়া একদিকে চলিয়া গেল। খানিক দূর গিয়া মুখ ফিরাইয়া আবার সে আমার দিকে চাহিল। আমি তখনও কৌতূহলী হইয়া তা'র দিকে তাকাইয়া আছি দেখিয়া সে হন্ হন করিয়া খানিকটা আগে চলিয়া গেল। তা'রপর ফিরিয়া আবার আমার দিকেই আসিতে লাগিল।

একেবারে আমার সুমুখে আসিয়া দু' চারবার ঢোঁক্

গিলিয়া সে দ্বিধার সহিত বলিল, "আপনি—আপনি কি আমাকে চিন্‌তে পার্‌চেন ?"

বাস্তবিক, লোকটাকে চিনি চিনি মনে হইতেছিল; কিন্তু ঠিক স্মরণ না হওয়াতে আমি একটু বোকা বনিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিলাম।

সেও সন্দিগ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম ত পূর্ণেন্দুবাবু ?"

আমি একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলাম, "আজ্ঞে হাঁা।"

"আর আমি হচ্চি জগাই—হা হা হা !"

খুব খানিকক্ষণ হাসিয়া হঠাৎ হাসি থামাইয়া সে খপ্‌ করিয়া আমার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "কি হে পূর্ণ,—আউট্‌ অফ্‌ সাইট্‌, আউট্‌-অফ্‌ মাইণ্ড, নাকি বাবা ? গ্লাস ফ্রেণ্ড না হ'লেও আমি ত তোমার ক্লাশ-ফ্রেণ্ড সে কথাটা কি স্রেফ্‌ ভুলে' বসে' আছ—অ্যাঁ ?"—বলিয়াই সে আমার হাত ছাড়িয়া মুরুব্বিয়ানার সহিত পিঠ্‌ চাপ্‌ড়াইতে সুরু করিয়া দিল।

এতক্ষণে চিনিলাম,—জগাই বটে ! ছেলেবেলায় তা'র সঙ্গে স্কুলে পড়িয়াছিলাম। তা'র মত ডান্‌পিটে ও বকাটে ছেলে ক্লাশে আর দু'টি ছিল না। দুষ্টামির নিত্য নূতন ফন্দি চট্‌ পট্‌ আবিষ্কার করিতেও সে অদ্বিতীয় ছিল।

আমরা তাঁকে জুজুর মত ভয় করিতাম। যে পণ্ডিত মাথায় টিকি বজায় রাখিতে চাহিতেন—তিনি সাধ্যমত জগাইচাঁদকে ঘাঁটাইতেন না। চেয়ারে চারিটা পায়ার তলায় চারিটা সুপারি রাখিয়া মাষ্টার মশাইকে যে কতবার সে 'পপাত ধরণীতলে' করিয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না। স্কুলের হেড্-মাষ্টার বেজায় কড়া ও গরম মেজাজের লোক ছিলেন। প্রথম দিনকতক তিনি জগাইচাঁদকে শায়েস্তা করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু জগাইচাঁদ সপ্তাহখানেক ধরিয়া তাঁহার তামাকে লঙ্কাবাটা মিশাইয়া, চেয়ারে ষাট সত্তরটি ছারপোকা ছাড়িয়া এবং জুতার ভিতরে আলপিন ঢুকাইয়া তাঁহাকেই দস্তুরমত শায়েস্তা করিয়া দিল। হেড্ মাষ্টারের কড়া ও গরম মেজাজ একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

এ সেই জগাই! আজ পনর ষোল বৎসর তাহাকে দেখি নাই—এতদিন পরে এমন হঠাৎ তাহার সঙ্গে দেখা হইয়া যাওয়াতে মনে মনে কিছু খুসি হইলাম। জীবনের মাঝপথে বাল্যের সাথীকে দেখিলে খুসি হয় না, এমন লোকও বোধ করি সংসারে নাই।

হাসিতে হাসিতে জগাইকে লইয়া বাহিরের ঘরে গিয়া বসিলাম।

জগাইয়ের মাথায় লম্বা টেড়ি, চুলগুলা তেল-চক্চকে।

গায়ে একটা আধ-ময়লা চুড়ীদার পাঞ্জাবী, জামাটা যে ইস্ত্রি করা হয় নাই, বাড়ীতেই 'জলকাচা' হইয়াছে, সেটা বেশ স্পষ্টই বুঝা যায়। পরণে একখানা চওড়া-পাড়ের শাড়ী—নিশ্চয়ই কোন স্ত্রীলোকের। পায়ে তালিমারা অনেক দিনের পরা এক জোড়া পম্প্-স্থ,—ডান পায়ের জুতাটি মুখব্যাদান করিয়া হাওয়া খাইতেছে। বাঁ হাতে একগাছা পিচের ছড়ি,—মাথার দিক্‌টা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; ডান হাতে একটা বিড়ি—সবটাই প্রায় পুড়িয়া গেলেও জগাই অতি সন্তর্পণে বিড়ির গোড়ার দিক্‌টা ধরিয়া যথেষ্ট উৎসাহের সহিত টানিতে ছাড়িতেছে না।

জগাই, জামার সাম্‌নেকার নীচের অংশটি কোলের ভিতরে গুঁজিয়া বসিয়া পড়িল। আমি লক্ষ্য করিলাম, জামার সেখানটায় লম্বা সেলাই করা। সেলাইটা যে আমার চোখে পড়ে, বোধ হয় জগাই সেটা পছন্দ করে না—তাই সেলাইটা কোলের ভিতরে ঢাকিয়া রাখিল। বুঝিলাম জগাইয়ের মনে বাবুগিরির সখটুকু বিলক্ষণ, কিন্তু বেচারীর পয়সার ভারি খাঁকৃতি।

সাম্‌নে টিনের বাক্সে ভাল ইজিপ্‌সিয়ান সিগারেট ছিল। বাক্সটি দেখিবামাত্র জগাই হাতের বিড়িটা ফেলিয়া দিয়া, টপ্ করিয়া একটি সিগারেট ধরাইয়া ফেলিল। তা'রপর চেয়ারে

হেলিয়া পড়িয়া কড়িকাঠের দিকে তাকাইয়া পরম আরামের সহিত হুহু করিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, "বাঃ বাঃ বেড়ে সিগারেট ত !"

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, "তারপর জগাই, কেমন আছ, বল।"

জগাই টেবিলের উপরে নবাবের মত একখানা পা তুলিয়া দিয়া নাচাইতে নাচাইতে বলিল, "আছি ভাল। খাচ্চি-দাচ্চি বেড়িয়ে বেড়াচ্চি। তবে কি জান, যা কিছু কষ্ট অন্ন-বস্ত্রের।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "কি রকম ?"

জগাই চেয়ারের দু'-পাশে হাত দুলাইতে দুলাইতে বলিল, "মাই ডিয়ার পূর্ণ, ব্যব্‌সা-ট্যব্‌সা কি পুলিসের জ্বালায় আর কর্‌বার যো আছে ! আরে ছিঃ ছিঃ ! ঘেন্না ধরিয়ে দিলে।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "পুলিসের জ্বালায় ব্যবসা বন্ধ ! সে কি রকম ব্যবসা ?"

জগাই সোজা হইয়া বসিয়া টেবিলে একটা চড়্‌ মারিয়া বলিল, "খুব ভাল ব্যবসা পূর্ণ, খুব ভাল ব্যবসা। পেটেণ্ট আর স্বপ্নাদ্য ওষুধের ব্যবসা করে' দিনকত দু'-হাতে টাকা লুটে' নিয়েছিলাম ;—তা', তা'ই দেখে' টিকৃটিকি-বেটাদের চোখ টাটিয়ে উঠ্‌ল।"

আমি কৌতূহলী হইয়া বলিলাম, "কেন ?"

"আরে, সে কথা আর জিজ্ঞেস্ কর কেন? খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, "বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত, আমেরিকার জন সাহেবের আবিষ্কৃত অদ্ভুত দন্তমঞ্জন।" দিনকতক খুব বিক্রী হ'য়েছিল, এর মাঝে হঠাৎ টিক্‌টিকি-বেটারা কেমন করে' ধরে' ফেল্লে যে, আমার অদ্ভুত দন্তমঞ্জনে সুধু ইঁটের গুঁড়ো আছে; এই আর কি—অমনি মামলা রুজু। আমি কিন্তু সহজে ছাড়ি নি বাবা,—শত শত প্রমাণ দেখিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটকে প্রাঞ্জল ভাষায় বোঝাতে চেষ্টা করে'ছিলুম যে, যে দন্তমঞ্জনে বিশুদ্ধ ইঁটের গুঁড়ো থাকে, সত্যসত্যই তা' অদ্ভুত কি না। ম্যাজিষ্ট্রেট শুনে' হেসে ফেল্লেন; কিন্তু হেসেই আমার দু'শো টাকা জরিমানা কর্লেন। সেইদিন থেকেই ব্যবসা বন্ধ।

বুঝিলাম, জগাইএর দুষ্টামি-বুদ্ধি এখনও যায় নাই; কিন্তু, সেইসঙ্গে তাহার সরলতাটুকুও আমার কাছে নেহাৎ মন্দ লাগিতেছিল না।

জগাই তৎক্ষণে প্রথম সিগারেটটা পুড়াইয়া ছাই করিয়া আর একটা ধরাইয়া বলিল, "যা'হোক্, মাই ডিয়ার পূর্ণ, তোমাকে এতদিন পরে হঠাৎ আবিষ্কার করে' আমি মনে মনে বড়ই খুসী হ'য়ে উঠে'চি। ইচ্ছে হচ্ছে গলা ছেড়ে গান গাই—" বলিয়াই বাঁ-হাতে টেবিল চাপড়াইয়া মাথা নাড়িয়া সে গান সুরু করিয়া দিল—

"ভোজ্‌ন ষ্কর কৃষ্ণ জিরে,
ভজন কর কৃষজী রে-এ—এ—এ—"

গানের চোটে ঘরখানা যেন কাঁপিতে লাগিল। পাছে বাড়ীর ভিতর আমার স্ত্রী গান শুনিয়া ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠেন, সেইজন্য তাড়াতাড়ি আমি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, "ও জগাই, থাম, থাম,—গান-টান পরে শোনা যাবে অখন।"

জগাই গান থামাইয়া দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "ওই ত দাদা! ওস্তাদ্‌জী তাইতেই বলেন, রসজ্ঞ শ্রোতা দুনিয়ায় বড়ই কম পাওয়া যায়। এই দেখ না, এমন খাসা টপ্পাখানা ধরা গেল, কোথায় সমের ঘরে মস্‌গুল হ'য়ে মাথা নেড়ে সায় দেবে, তা' সে সব চুলোয় গেল—অন্তরাটা ধর্‌তে না ধর্‌তে তুমি কিনা আমাকে থামিয়ে দিলে! আরে ছ্যাঃ—ছ্যাঃ!"

জগাই সিগারেটে একটা দমভোর্ টান্ দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে জড়িতস্বরে বলিল, "তুমি বোধ হয় পত্য-টত্য পড়ো না? এবার থেকে পড়্‌তে চেষ্টা কর্‌বে। নইলে রসবোধ হবে না।"

আমি যে অরসিক নই, এটা প্রমাণিত করিতে গেলে, পাছে জগাইচাঁদ দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া আবার 'কৃষ্ণ জিরে'র গান ধরিয়া বসে, সেই ভয়ে এ অপবাদ আমি মাথা পাতিয়া লইলাম।

আরও দু'-চারিটা কথার পর জগাই সেদিনকার মত বিদায় লইল। যাইবার আগে সে আর একবার আমার সিগারেটের তারিফ্ করিতে করিতে বেশ সপ্রতিভ ভাবেই কৌটা হইতে গোটা কুড়ি ইজিপ্‌সিয়ান সিগারেট লইয়া টপাটপ পকেটে পুরিয়া ফেলিল ; তাহার এই সপ্রতিভ ভাবটাও খুব শিষ্ট না হইলেও আমার বেশ মিষ্ট লাগিতেছিল ; কিন্তু যতই মিষ্ট লাগুক্, এটা ঠিক যে, তা'র পরদিন হইতে আমি টেবিলের উপরে দামী ইজিপ্‌সিয়ান সিগারেটের বদলে হাওয়াগাড়ী সিগারেটের কৌটা রাখিয়া দিতাম।

কিন্তু জগাইচাঁদের অসাধারণ উৎসাহ তাহাতেও কিছুমাত্র দমিয়া যায় নাই ; প্রতিদিন সে অন্ততঃ গোটা দশ-বারো সিগারেট না পুড়াইয়া ও গোটা পনর না পকেটস্থ করিয়া কোনদিন আমার ঘর ছাড়িয়া উঠিয়া যাইত না।

খ

হ্যাঁ,—বাস্তবিক, জগাই আমাদের বেড়ে লোক। ছুটির একঘেয়ে দিনগুলা তাহাকে লইয়া হাসি-খুসিতে গোলে-হরিবোলে দিব্য একরকমে কাটিয়া যাইত।

তাহার কথাবার্ত্তার ভিতরে আমি একটা বিশেষত্ব সর্ব্বদা লক্ষ্য করিতাম। যখন-তখন সে তাহার স্ত্রীর কথা পাড়িত ও যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গেই জগাই সে কথাগুলা বলিত। সে যে তা'র

স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসে, এটা আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম।

মধ্যে জগাই একদিন আমাকে তা'র বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। লোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া হাঁ করিয়া লুচির আশায় বসিয়া থাকাটা আমি আদোপেই ভালবাসিতাম না; কিন্তু জগাই পাছে মনে করে যে, সে গরীব বলিয়াই আমি তাহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণে যাইতে নারাজ, সেই ভয়ে তাহার কথা ঠেলিতে পারিলাম না।

জগাই খাবারের বন্দোবস্ত বড় মন্দ করে নাই। তাহার স্ত্রীর রান্নাও বেশ হইয়াছিল।

খাইতে বসিয়া দেখিলাম, একটি গৌরাঙ্গী মহিলা আমাকে পরিবেশন করিতেছেন।

জগাই আমার সুমুখেই, মেঝের উপরে উবুড় হইয়া বসিয়াছিল। মহিলাটি ঘরে আসিবামাত্র জগাই উচ্চকণ্ঠে বলিল, "মাই ডিয়ার পূর্ণ, এস, আমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমাকে ইণ্ট্রডিউস্ করে' দি। ইনি হচ্ছেন আমার স্ত্রী শ্রীমতী কমলা দাসী,—আর, ওগো! শুনচো? ইনি হচ্ছেন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন—আমার গ্লাশ-ফ্রেণ্ড না হ'লেও ক্লাশ-ফ্রেণ্ড। ওকি, মুখে ঘোমটা কেন? পূর্ণর সাম্‌নে ঘোমটা! অ্যাঃ—বল কি! খোল, খোল—ঘোমটা খোল।"

মহিলাটি মুখের ঘোমটা আরও বেশী করিয়া টানিয়া, সলজ্জ, ত্রস্তপদে তাড়াতাড়ি ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন।

আমিও লজ্জায় অধোবদন হইয়া বসিয়া রহিলাম।

খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে পর বিদায় লইয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, এমন সময়ে জগাই আমার হাত ধরিয়া বলিল, "মাই ডিয়ার পূর্ণ, তুমি কি আমার ওপর রাগ করে'চ ?"

আমি একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "রাগ ! কেন ?"

জগাই বলিল, "আমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার পরিচয় করে' দেবার সময়ে যে কথাগুলো বলে'ছিলাম,—সেই জন্যে ? আমার স্ত্রী বল্‌লে, আমি নাকি অসভ্য ব্যবহার ক'রেচি আর তুমি তা'ই চটে' গিয়েছ। সে বল্‌লে, তোমার কাছে আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "না না আর ক্ষমা চাইতে হবে না,—আমি রাগ করি নি।"

গ

সেদিন জগাই হঠাৎ আসিয়া আমাকে বলিল, "মাই ডিয়ার পূর্ণ, আমার একটা উপকার কর্‌তে হবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি উপকার ?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া জগাই বলিল, "যদি—যদি

আমাকে কুড়িটা টাকা ধার দাও। আমি 'তিনদিনের ভেতরে নিশ্চয় শোধ কর্‌ব। দেবে ভাই ?"

তাহাকে কুড়িটা টাকা দিলাম। সে আমাকে অনেক ধন্যবাদ জানাইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

জগাই 'অগস্ত্য-যাত্রা' করিয়াছে। তিনদিনের ভিতরে টাকা শোধ করিবে বলিয়া সেই-যে সে চলিয়া গিয়াছে, আর তাহার টিকিটি পর্য্যন্ত দেখিবার যো নাই। অবশ্য, টাকার জন্য আমি ব্যস্ত নই; কিন্তু জগাইয়ের অভাবে আমার দিন গুলা ভগ্নচক্র শকটের মত স্তম্ভিত হইয়া আছে, সময় আর কাটিতেই চাহে না। এই জন্যই বন্ধু বান্ধবকে টাকা ধার দিতে নাই; তা'তে টাকাও পাওয়া যায় না, বন্ধুত্বও থাকে না।

প্রায় কুড়িদিন কাটিয়া গিয়াছে। আমি জগাইয়ের আশা-ভরসা একরকম ছাড়িয়াই দিয়াছি। এক একবার মনে করিয়াছি, জগাইয়ের বাড়ীতে গিয়া খোঁজ লইয়া আসি, কিন্তু পাছে সে ভাবিয়া বসে যে, আমি তাগাদা করিবার জন্য তাহার খোঁজ লইতেছি, সেই ভয়ে তাহার বাড়ীতে যাওয়াও আর ঘটিয়া উঠিল না।

কিন্তু, ইহার ভিতরে জগাই নিজেই একদিন আসিয়া হাজির।

আমি বলিলাম, "কি হে জগাই, একেবারে ডুমুরের ফুল হ'য়ে উঠে'চ যে!"

জগাই বলিল, "মাই ডিয়ার পূর্ণ, আমি এখন আবার বিজ্‌নেস্‌ম্যান অর্থাৎ মাতৃভাষায়, কাজের লোক হ'য়ে উঠে'চি। আমার সময় এখন মূল্যবান্।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "বল কি! 'অদ্ভুত দন্তমঞ্জন' ফের্ বাজারে চল্‌ছে নাকি?"

"আরে ছেৎ! 'অদ্ভুত দন্তমঞ্জ'নের নিকুচি ক'রেছে! মাই ডিয়ার পূর্ণ, সে সব কিছু নয়—আমি এখন দালালী ব্যবসা ধরে'চি।"

দালালীর গুপ্তরহস্য সম্বন্ধে জগাইচাঁদ লম্বা এক বক্তৃতা ফাঁদিয়া বসিল, আমি চুপচাপ শুনিয়া যাইতে লাগিলাম।

বক্তৃতা শেষ করিয়া জগাইচাঁদ উঠিয়া দাঁড়াইল। পকেট হাত্‌ড়াইয়া একখানা নোট বাহির করিয়া জগাই বলিল, "মাই ডিয়ার পূর্ণ, তোমার টাকা কুড়িটা নাও। বিজ্‌নেসে বড় ব্যস্ত ছিলাম বলে' এদিকে আস্‌তে পারি নি, তোমার টাকাগুলোও সেইজন্যে আর দেওয়া হয় নি, কিছু মনে কর' না ডিয়ার!"

নোটখানা লইয়া আমি ব্যাগের ভিতরে রাখিয়া দিলাম।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জগাই বলিল, "পূর্ণ,

তোমাকে আর একটা কথা বল্‌ব-বল্‌ব মনে কর্‌চি, কিন্তু বল্‌তে পার্‌চি না।"

"কেন ?

"পাছে তুমি কিছু মনে কর।"

"মনে আবার কর্‌ব কি ? বল।"

"মাই ডিয়ার পূর্ণ, আমার স্ত্রী আজ এক জায়গায় নিমন্ত্রণে যাবে, যদি একছড়া হার দাও, তা'হলে ভারি উপকার হয়। তা'র হারছড়া ছিঁড়ে গেছে। আজ নিয়ে যাব, কাল্‌কেই ফিরিয়ে দেব।"

জগাইয়ের আজকের প্রার্থনাটা আমার কাছে ভারি বেসুরো ঠেকিল ; কিন্তু কি আর করি, চক্ষুলজ্জার খাতিরে মনে মনে বিরক্ত হইয়াও বাড়ীর ভিতরে গেলাম। পত্নীর কাছ থেকে তাঁহার হারছড়া চাহিয়া জগাইকে আনিয়া দিলাম।

ঘ

পরদিন বৈকালে কতকগুলা জিনিষ কিনিতে 'মিউনিসিপাল মার্কেটে' গিয়াছিলাম।

জিনিষ পত্র কেনা হইয়া গেল। আমার কাছে খুচ্‌রা টাকা ছিল না, ব্যাগের ভিতর জগাইয়ের দেওয়া নোটখানা বাহির করিয়া দোকানদারকে বলিলাম, "টাকা ভাঙ্গাতে হবে।"

দোকানদার নোটখানা আমার হাত হইতে লইয়া বিস্ফারিত চোখে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। তা'রপর আমার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, "কি ম'শয়, এ সব জোচ্চুরী কতদিন শিখে'চেন ?"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া ভ্রূ-সঙ্কোচ করিয়া বলিলাম, "কি বল্‌লে ?"

"ওঃ ! বাবু যে একেবারে আকাশ থেকে পড়্‌লেন দেখ্‌চি ! আমি হচ্চি লালু মিঞা, আমার কাছে এসেছ জাল নোট চালাতে ! পাজী, ত্যাঁদড়্ কোথাকার !"

"কি বল্‌ছিস্ উল্লুক ?"

"চুপ রহো ! ওরে, পুলিস ডাক্ ত !"

আমার চারিদিকে লোক জড় হইল। লজ্জায়, অপমানে যেন আমার মাথাকাটা গেল। নোটখানা দেখিয়া বুঝিলাম, দোকানদারের কথা মিথ্যা নয়।

বেগতিক দেখিয়া আমি নরম হইয়া বলিলাম, "দেখ, আমি জানতুম'না যে, নোটখানা জাল। আর একজন আমাকে এখানা দিয়েচে।"

দোকানদার গরম হইয়া বলিল, "হুঁ হুঁ চাঁদ ! পথে এস ! আমি হলুম লালু মিঞা, আমার কাছে এসেছ জাল-নোট চালাতে ! ওরে পুলিস ডাক্ ত !"

কোনরকমে তাহাদের হাত হইতে ছাড়ান্ পাইয়া আমি সেখান হইতে মানে মানে সরিয়া পড়িলাম।

ওঃ! সে সময়ে যদি একবার জগাইয়ের দেখা পাইতাম!

পিছনে বাজারসুদ্ধ লোক হাসিতে লাগিল। দোকানদার গলা চড়াইয়া তখনও বারংবার গর্জ্জন করিতেছে, "আমি হলুম লালু মিঞা, আমার কাছে এসেছ জাল-নোট চালাতে! ওরে, পুলিস ডাক্ ত!"

৬

জগাই কোথায়?

বাজারের সেই ব্যাপারের পরে একমাস কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু জগাইয়ের দেখা নাই।

আমি তা'কে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম—এমন কি, তাহার বাড়ীতে পর্য্যন্ত গিয়াছি; কিন্তু, সে বাড়ী ছাড়িয়া জগাই যে সপরিবারে কোথায় উঠিয়া গিয়াছে, কেহ তাহা জানে না।

বাড়ীওয়ালা আমাকে বলিল, "মশাই, সে আমার পাঁচ-মাসের ভাড়া দেয় নি। তা'র সঙ্গে যদি আপনার দেখা হয়, তা'হলে বলে' দেবেন, একবার যদি তা'র টিকিটি দেখ্‌তে পাই, তবে হয় তা'র মাথা নয় পাঁচমাসের ভাড়া না নিয়ে আর ছেড়ে দেব না। আমরা পাঁচপুরুষ কল্‌কাতা-সহরের বাড়ীওলা—

আমাকেই ফাঁকি—অ্যাঁ! হয় ভাড়ার টাকা নয় মাথা—একটা কিছুই নেবই নেব,—বুঝে'চেন ?"

বুঝিলাম, জগাইয়ের দেখা ত আর পাবই না—সেইসঙ্গে আমার দামী সোণার হারছড়াও জন্মের মত গেল। জগাইয়ের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠতা করিয়াছিলাম বলিয়া এখন আমি মনে মনে অনুতপ্ত হইলাম। ওঃ! তা'র জন্যে সেদিন দশজনের সাম্‌নে কি অপমানিতই হইয়াছিলাম! আর একটু হইলেই হাতে হাতকড়ি পড়িত! ইচ্ছা ছিল, জগাইকে ধরিয়া সে অপমানের প্রতিশোধ লইব; কিন্তু মনের রাগ মনেই চাপিয়া গুম্‌রাইতে গুম্‌রাইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

* * * * *

আমার ছুটি প্রায় ফুরাইয়া আসিল। সেদিন বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়াছি, এমন সময়ে খানিক তফাতে একটা লোককে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম।

কে ও? জগাই না! হ্যাঁ—তা'ই ত!

আমি তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া একেবারে তাহার সুমুখে গিয়া দাঁড়াইলাম।

আমাকে দেখিবামাত্র জগাইয়ের মুখ ভয়ে কালিপানা হইয়া গেল। সে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু আমি তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, "কি জগাই, চিন্‌তে পারচ ?"

জগাই থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ঢোক্ গিলিয়া বলিল, "কে মশাই, আপনি?"

আমি কঠোরস্বরে বলিলাম, "বটে? তুমি আমাকে চেন না—না?"

জগাই বলিল, "পথ ছাড়ুন মশাই, পথ ছাড়ুন। রাস্তার মাঝখানে আর অসভ্যতা কর্‌বেন না।"

আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না—তাহার মুখে সজোরে এক চড়্ বসাইয়া দিয়া বলিলাম, "নির্লজ্জ, চোর, জালিয়াত! দে আমার হার দে।"

চড়্ খাইয়া জগাই ষাঁড়ের মত চেঁচাইয়া উঠিল। "পাহারাওলা, আমায় খুন কর্‌লে—পাহারাওলা, পাহারাওলা!"—বলিতে বলিতে সে ছুটিল। আমিও ছাড়িলাম না—তাহার পিছনে-পিছনে ছুটিলাম। রাস্তার অনেক লোকও মজা দেখিতে আমাদের অনুসরণ করিল।

জগাই, ছুটিতে ছুটিতে হঠাৎ একটা বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ঢুকিলাম।

জগাই সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে গেল; কিন্তু হোঁচট্ খাইয়া ঘুরিয়া পড়িল। আমি একেবারে তাহাকে মাটীর সঙ্গে চাপিয়া ধরিলাম।

জগাই আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "খুন কর্‌লে, খুন কর্‌লে!"

গোলমালে একজন লালপাগড়ীও বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়াছিল। সে কাছে আসিয়া বলিল, "কি হ'য়েচে বাবু?"

জগাই বলিল, "ও পাহারাওলা-জি, আমাকে বাঁচাও! এই হতভাগা গুণ্ডা আমাকে মেরে ফেল্লে!"

রাগে অজ্ঞান হইয়া আমি বলিলাম, "ষ্টুবিড্, আবার গালাগালি!"—আমি ঘুসি তুলিলাম।

হঠাৎ পিছন হইতে কে আমার হাত চাপিয়া ধরিল। ফিরিয়া দেখি, একজন স্ত্রীলোক।

তাঁহার মাথার কাপড় খুলিয়া গিয়াছে, একরাশ এলোমেলো চুল কাঁধে বুকে এলাইয়া পড়িয়াছে, মুখে চোখে ভীতা হরিণীর মত অসহায়, কাতর ভাব!

আমার হাত অসাড় হইয়া পড়িয়া গেল।

মহিলাটি মিনতি-মাখা স্বরে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ইনি আমার—ইনি আমার স্বামী! এঁকে আপনি মারুচেন কেন?"

জগাইয়ের স্ত্রী? এত সুন্দরী!

আমি মৃদুস্বরে বলিলাম, "আপনার স্বামীর জন্যে আমি ভয়ানক অপমানিত হয়ে'চি। আপনার স্বামী আমার একছড়া হার নিয়ে এসে আর ফিরিয়ে দেয়নি। একে পুলিসে দেব।"

মহিলার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি জগাইয়ের দিকে

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাহিলেন,—জগাই আস্তে আস্তে মাথা হেঁট করিল।

রমণী আবার আমার দিকে তাকাইলেন। সে চোখ কি ব্যথাভরা!

তিনি একবার পাহারাওয়ালার দিকে, ভিড়ের দিকে চাহিলেন। তাঁহার দেহ, লজ্জা-ভয়ে যেন কাঁপিয়া উঠিল। তা'রপর তিনি হঠাৎ গলা হইতে একছড়া হার খুলিয়া, আমার সুমুখে ধরিয়া বলিলেন, "আমার এই একছড়া হার আছে। আমাদের ঘরে আর হার নেই। এ হার কি আপনার?"

হ্যাঁ—এ হার ত আমারই বটে! আমি কি বলিতে যাইতেছিলাম; কিন্তু তাঁহার চোখের দিকে চাহিয়া থামিয়া গেলাম। সে চোখ যেন কথা কহিতেছিল, সে চোখ যেন বলিতেছিল, "ওগো আমার স্বামীকে বাঁচাও,—ওগো আমার স্বামীকে বাঁচাও!"

আমি কি বলিব?

রমণী আবার বলিলেন, "এ হার কি—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "না, এ হার আমার নয়—মাপ করুন, মাপ করুন—আমার ভুল হ'য়েচে।"

রমণী মাথায় ঘোমটা টানিয়া আমার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

জগাই, লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "শুন্‌লে ত প্াহারাওলা সায়েব, শুন্‌লে ত সব? মিছামিছি আমায় কি নাকালটাই কর্‌লে! আচ্ছা বাবা, ভগবান্ আছেন।"

চ

সন্ধ্যাবেলায় বাড়ীতে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলাম, "বোঝা গেছে, ওরা স্বামী স্ত্রীতে জোচ্চোর! সুন্দর মুখ দেখে' ভুলে' যাওয়াটা ঠিক হয় নি।"—এমন সময়ে একজন লোক আসিয়া আমার হাতে একটা মোড়ক দিয়া দাঁড়াইল।

একটু বিস্মিত হইয়া মোড়কটা খুলিলাম। ভিতরে আমার সেই হারছড়া আর একখানা চিঠি। চিঠিখানা পড়িলাম:—

"আমার স্বামীর অনেক দোষ,—কিন্তু তিনি আমাকে ভালবাসেন।

"আমি সামান্য স্ত্রীলোক,—তাঁ'কে একদিন বলে'ছিলাম, তুমি আমাকে ভালবাস না। ভালবাস্‌লে, আমাকে অন্ততঃ একখানা গয়নাও দিতে।

"তা'র পরের দিন তিনি আমাকে একছড়া হার এনে দিয়ে বল্লেন, 'একজন বেচ্‌তে চাচ্ছিল, তোমার জন্যে কিনে আন্‌লুম।'—তখন আমার একটু আশ্চর্য্য হ'লেও, আমি সন্দেহ করি নি।

"ভগবান্ আপনার মঙ্গল কর্‌বেন,—আপনি আমার স্বামীকে পুলিসের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।

"লজ্জাহীনাকে ক্ষমা কর্‌বেন, আপনার হার ফিরিয়ে দিলাম।"

আমার চোখের সুমুখে এক জ্যোতির্ময়ী দেবী-প্রতিমা জাগিয়া উঠিল।

হে দেবি, আমি তোমাকে প্রণাম করি।

অভিশপ্তা

কাশীর মানমন্দির দেখিতে গিয়াছি। পূর্ণিমার সন্ধ্যা। নীলপদ্মের রংমাখান আকাশ, তার নীচে গঙ্গার ধবল লহর-বীণায় তরল লীলা রাগিণী বাজিতেছে। এই রূপ-পুরীকে সম্পূর্ণতা দিবার জন্যই, যেন বসন্তের গুঞ্জরিত নবীন হাওয়া আজ প্রকৃতির মুঞ্জরিত কুঞ্জদুয়ারে অতিথি।

মানমন্দির দেখা শেষ হইয়া গিয়াছিল; অতএব বিশ্বের এই যৌবন-শ্রীকে অবহেলা করিতে পারিলাম না—আস্তে আস্তে ছাদের এক পাশে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। তখন চাঁদ উঠিতেছে।

আমি কবি নই; কিন্তু তবু যেন মনে হইল, গঙ্গার চপল জলে জ্যোৎস্না ঐ যে রূপার 'আখর' লিখিয়া দিতেছে, চেষ্টা করিলে আজ যেন তাহার ভিতরে সৌন্দর্য্য-কাব্যের দু'একটা ইঙ্গিত জানিলেও জানিতে পারা যায়; এবং মন-মাতান সুগন্ধ মাখিয়া বসন্তবায়ু আজ যে সঙ্গীত গাহিতেছে, তাহা যেন প্রকৃতির ফুলবাগানের কুঁড়ি-ফোটার আনন্দোৎসব ভিন্ন আর কিছু নয়!

অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম,—কতক্ষণ, তা জানি না।

হঠাৎ আমার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। ঘড়ী খুলিয়া দেখি, রাত্রি সাড়ে দশটা। তাইত!

তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম। অন্ধকারে সিঁড়ি দিয়া দেয়াল ধরিয়া ধরিয়া কোনরকমে আঙ্গিনায় নামিয়া আসিলাম। দু'একবার হোঁচট্ খাইয়া সদর দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দরজা ধরিয়া টানিলাম,—কিন্তু দ্বার খুলিল না। দ্বার বাহির হইতে বন্ধ।

আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি যে ছাদের উপরে বসিয়া কবিত্বের স্বপ্ন দেখিতেছি, রক্ষক অত শত খেয়াল করে নাই। সে দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

এখন উপায়? একবার শেষ চেষ্টা করিলাম। দরজার উপরে সতেজে এক ধাক্কা মারিলাম—বহু যুগের প্রাচীন কবাট, ঝন্-ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল—সেই বিশাল শূন্য পুরীর নৈশ মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া আর্ত্তনাদের মত একটা তীক্ষ্ণ প্রতিধ্বনি সহসা জাগিয়া উঠিয়া আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত করিয়া তুলিল।

ভয়ে ভয়ে আবার ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। প্রাঙ্গণের মধ্যে একটা বিপুলদেহ বৃক্ষ, আপনার বিস্তৃত শাখা-প্রশাখার ভিতরে খানিক আলো এবং খানিক অন্ধকার লইয়া দাঁড়াইয়া

আছে ;—কি ভীষণ তাহার পত্র-মর্ম্মর ! যেন সুদূর অতীতের দেহমুক্ত আত্মারা তাহার ডালে উপবিষ্ট হইয়া ঘন ঘন তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছে ! এবং ঐ যে তিমির-গুপ্ত নিশাচর পক্ষীরা ঝট্‌পট্‌ ডানা নাড়িয়া স্তম্ভিত স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করিয়া দিতেছে, স্থান ও কাল-মাহাত্ম্যে বোধ হইল, তাহা যেন অপরজগৎচারী আত্মা সকলের অস্ফুট মধুর ধ্বনি ! বুকটা কেমন দমিয়া গেল। আপনার কুবুদ্ধিকে শত শত ধিক্কার দিতে দিতে সচকিত চিত্তে সাম্‌নের একটা ঘরের দরজা খুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। চারিদিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার। ভিতরটা একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইবার জন্য পকেট হইতে দেশ্‌লাই বাহির করিয়া জ্বালিলাম। দীপশলাকার ক্ষীণালোকে গৃহভিত্তির উপরে মোগল-যুগের প্রাচীন কারুকার্য্য ঈষৎ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। অন্ধকারকে আরও গাঢ় করিয়া শলাকা নিবিয়া গেল। কেন জানি না, গা'টা কেমন ছম্‌-ছম্‌ করিতে লাগিল। সেই বিস্তৃত কক্ষের নিবিড় তিমিররাশির ভিতরে যেন অপর জগতের কি একটা বিষাদ-ম্রিয়মাণ রহস্য গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছিল।

অত্যন্ত অপ্রসন্ন চিত্তে ঘরের এক কোণে গিয়া শুইয়া পড়িলাম। আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়া ভাবিতে লাগিলাম, কোথায় আজ সে সকল শিল্পী,—অলঙ্কৃত গৃহভিত্তির উপরে যাহাদের নিপুণ হস্তের চিহ্নাবশেষ এখনও ক্ষোদিত হইয়া

রহিয়াছে? কোথায় আজ সেই মানসিংহ, সেই জয়সিংহ,—কক্ষ মধ্যে যাঁহাদের অসামান্য সম্মান-স্মৃতি এখনও জাগ্রৎ হইয়া রহিয়াছে? কোথায় সেই উজ্জ্বল অতীত, কোথায় সে রাজ-ঐশ্বর্য্য?

সহসা একটা দম্‌কা ঝট্‌কার ঝাপটে বাহিরের বৃক্ষপত্রে কেমন যেন অনৈসর্গিক মর্ম্মরধ্বনি বহিয়া গেল এবং সেই সঙ্গে ঘরের ভেজানো দরজাটাও সশব্দে খুলিয়া গেল এবং আমার তন্দ্রাবিষ্ট শ্রবণের উপর কে যেন মুখ রাখিয়া অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল,—"কোথায়, ওগো কোথায়?"

একলাফে উঠিয়া বসিলাম এবং দেওয়ালের উপরে আড়ষ্ট-ভাবে পৃষ্ঠ রাখিয়া দুই হাতে চোখ কচ্‌লাইয়া চাহিয়া দেখি, উন্মুক্ত দ্বারপথে চন্দ্রালোক আসিয়া ঘরের একাংশ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

চারিদিক্ কি স্তব্ধ! আর, আর—সেই জনশূন্য প্রাচীন অট্টালিকার মধ্যে সে স্তব্ধতা কি ভীষণ!

হঠাৎ মনে হইল, ঘরের অন্ধকার দিক্‌টায় কে যেন নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতেছে! যেন কার বস্ত্রের অস্ফুট শব্দ হইতেছে, যেন মৃদু ভূষণ-শিঞ্জিত শুনা যাইতেছে। যেন কেহ ফুলিয়া ফুলিয়া চাপাগলায় কাঁদিয়া উঠিতেছে—যেন কেহ বুকভরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছে! কে সে? কে সে?

আমার দেহে কাঁটা দিল, মাথার চুলগুলা খাড়া হইয়া উঠিল। আমি রুদ্ধশ্বাসে প্রায়বদ্ধকণ্ঠে পাগলের মত বলিয়া উঠিলাম, "কে ? কে ? কে ?"

সহসা, কাহার একটা অতি-শীর্ণ ছায়া মুক্তদ্বার-মধ্যগত আলোক-রেখার মাঝে আসিয়া দাঁড়াইল !

এ কে ?

ভয়ে আমি চোখ বুজিতে গেলাম ; কিন্তু পারিলাম না—আমার চক্ষুকোটরের মধ্যে নিষ্পলকদৃষ্টি কি এক কুহকমন্ত্রে বিস্ফারিত হইয়া রহিল ! তদবস্থায় দেখিলাম, সম্মুখে নীরবে দাঁড়াইয়া মাংসমাত্রহীন সম্পূর্ণ কঙ্কালসার দেহ লইয়া আমার দিকে হেঁট হইয়া সে মূর্ত্তি একদৃষ্টিতে আমাকেই নিরীক্ষণ করিতেছে ! তাহার বিশীর্ণ বাহুযুগলে বলয়-কঙ্কন শ্লথ হইয়া হস্তাগ্রে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বস্ত্র, দেহের হাড়গুলাকে বেড়িয়া বেড়িয়া যেন লেপিয়া আছে। তাহার প্রকটাস্থি মুখ ও বুকের উপরে রাশীকৃত কেশদাম বিশৃঙ্খল হইয়া দোদুল্যমান, এবং তাহার পলকহীন চক্ষুতে কি এক তীক্ষ্ণ দীপ্তি !

ছায়ামূর্ত্তির অধরোষ্ঠের আবরণশূন্য দন্তপংক্তি—কাঁপিতে লাগিল এবং সেই দুঃসহ মৌন ভঙ্গ করিয়া কাতর, তৃষিতস্বরে সে বলিয়া উঠিল,—কোথায় ওগো কোথায় ?"

আমি অসাড় হইয়া বসিয়া রহিলাম। তখন, ছায়ামূর্ত্তি

ধীরে ধীরে তাহার কৃশ অস্থিসার পা বাড়াইয়া আমার দিকে অগ্রসর হইল।

চকিতে আমার জড়তা ভাঙ্গিয়া গেল। আমি প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিলাম, “চলিয়া যাও, চলিয়া যাও, আর এক পা আগাইলে তোমায় খুন্ করিব!” আমার সে সাহস, মৃত্যুর সম্মুখস্থ কাপুরুষের অন্তিম সাহসমাত্র!

ছায়ামূর্ত্তি কহিল, “আগন্তুক, সে একদিন গিয়াছে, যে দিন মৃত্যুকে আমি তোমারই মত ভয় করিতাম! এখন আমি জীবন-মৃত্যুর বাহিরে,—সংসারের ভয়-ভাবনা আর আমাকে ব্যথা দিতে পারে না, কিন্তু পৃথিবীর যাতনা যে এখনও আমাকে শতপাকে ঘিরিয়া আছে, আমাকে পুড়াইয়া পুড়াইয়া মারিতেছে, আমাকে পিষিয়া পিষিয়া পীড়ন করিতেছে! আগন্তুক, তুমি আমাকে দেখিয়া ভয় পাইতেছ? কিন্তু, একদিন আমার এই তনু ছিল কোমল, সুন্দর, দেববাঞ্ছিত! আজ আমার এই বাহু কুৎসিত, অস্থিসার,—কিন্তু এমন দিন ছিল, যখন আমার এ হাতদু'টি গোলাপফুলের একযোড়া মোহনমালার মত রাজকণ্ঠ বেষ্টন করিত! সেদিন গিয়াছে আগন্তুক, সেদিন গিয়াছে,—যে দিন এ দুটি চোখের সামনে পড়িবার জন্য শত শত উন্মুখহৃদয় আবেগে ব্যাকুল হইয়া উঠিত! হায়, সে কত যুগ আগে, ওগো কত যুগ আগে!”

আমি কোন উত্তর দিতে পারিলাম না—যেমন বসিয়াছিলাম, তেমনই কাঠ হইয়া বসিয়া রহিলাম।

ছায়ামূর্ত্তি কহিল, "আগন্তুক, তুমি আমার কথা শুনিবে? আজ কয় শতাব্দী, আমার অভিশপ্ত দোসর হারা আত্মা এইখানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাঁদিয়া মরিতেছে, দুটো দুঃখের কথা শুনাইবার জন্য আমার পিয়াসী বুক ফাটিয়া যাইতেছে, কিন্তু শূন্যগৃহে কোন দরদের দরদী ত পাইলাম না! তুমি শুনিবে আগন্তুক, তুমি শুনিবে?"

আমি কথা কহিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আমার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। ছায়ামূর্ত্তি তখন সেই দ্বারপথাগত পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় বসিয়া পড়িল। তাহার অস্থিদেহ হইতে বিকট একটা কড়কড়্ শব্দ উঠিল। তাহার কেশদামের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল—রেশমের মত চিকণ, কি সুন্দর সে কুন্তল!

আপনার বিগত যৌবনের, অতীত সৌন্দর্য্যের শেষ চিহ্নস্বরূপ সেই অলকমালা, ঈষৎ গর্ব্বের সহিত মুখের উপর হইতে সরাইয়া দিয়া ম্লান হাসি হাসিয়া ছায়ামূর্ত্তি কহিল, "এই চোখ, এই বুক, এই বাহু দেখিয়া একদিন কত মুগ্ধপ্রাণ আমার রূপের আগুনে ঝাঁপ দিয়াছে; আর আজ এই কেশ দেখিয়া আগন্তুক, তুমি কি আবার আমার সঙ্গে প্রেম করিবে?

না বন্ধু, না—অভাগীর এ কঠিন কঙ্কালস্তূপকে বুকে চাপিয়া আর কোন পাগল হৃদয় ধন্য হইবে না,—আমি এখন ভোরের বাসি মালা, পথের ধূলায় এখন আমার শয়ন, প্রখর তপনতাপে শুকাইয়া যাওয়াতেই এখন আমার অবসান ! কিন্তু কি বলিতে কি বলিতেছি !

আমার নাম ছিল, রাধা। রাজা জয়সিংহের অন্তঃপুরে রাজ-আদরে আদরিণী হইয়া বড় সুখে আমার দিন কাটিত। বলিয়াছি, আমি রূপবতী ছিলাম। সে রূপের বর্ণনায় আর কাজ নাই, কারণ, আজ তাহা কেহ বিশ্বাস করিবে না।

সেই রূপের মোহেই রাজা আমাকে ভাল বাসিতেন। সলিলচারী মৎস্য যেমন পাতালের আন্ধিয়ারে অন্ধ হইবার আশঙ্কায় উপরে আসিয়া ধরণীব্যাপী মুক্ত আলো, এবং মুক্ত আকাশ দেখিয়া যায়—রাজকার্য্যের কাঠিন্যের মধ্য হইতেও তেমনই করিয়া—রাজা, দিনে শতবার নানা অছিলায় আমার কাছে ছুটিয়া আসিতেন। আমাকে দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইত না, আমাকে আদর করিয়া করিয়া তাঁহার আশ মিটিত না, আমার সঙ্গে কথা কহিয়া কহিয়া তাঁহার শ্রান্তি বোধ হইত না—আমি ছিলাম তাঁহার প্রাণাধিক।

একদিন শুনিলাম, রাজা ৺ কাশীধামে যাইতেছেন। বাবা

বিশ্বনাথকে কখনও দেখি নাই, রাজা সেখানে যাইবেন শুনিয়া ভাবিলাম, এমন সুযোগ আর কখনও মিলিবে না।

রাজপদে আমার আর্‌জী পেশ করিলাম। আমার সাধ অপূর্ণ রাখা, রাজার পক্ষে সাধ্যাতীত। একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষটা তিনি মত দিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমি ৺ কাশীধামে আসিলাম।

চারিদিকের ভিড় ঠেলিয়া, ভিখারী তাড়াইয়া, আমার প্রহরিবেষ্টিত শিবিকা বাবা বিশ্বনাথের মন্দির-তোরণে আসিয়া স্থির হইল। প্রহরীরা মন্দিরের ভিতর হইতে লোক তাড়াইতে লাগিল, শিবিকামধ্যে বসিয়া, সেই কোলাহল শুনিতে লাগিলাম। মন্দিরের ভিতর বীণা বাজিতেছিল এবং আলাপিনীর মধুর রাগিণীর সঙ্গে কাহার কণ্ঠ, ভজন গায়িতেছিল :—

"ভোলানাথ, দিগম্বর
এ দুঃখ মেরা হরো!"

কি স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর!

হঠাৎ মাঝপথে গান থামিয়া গেল। বুঝিলাম, প্রহরীরা গায়ককে ভিতর হইতে তাড়াইয়া দিতেছে।

কেন জানি না, গায়ককে দেখিবার জন্য সহসা আমার মনে দুর্দ্দম বাসনা বলবতী হইয়া উঠিল। আস্তে আস্তে শিবিকার আবরণ একটু সরাইয়া দিয়া আমি পথপানে চাহিলাম।

কি দেখিলাম! যাহা দেখিব বলিয়া আশা করি নাই, তাহাই দেখিলাম।

দেখিলাম, এক সুবেশ, গৌরতনু তরুণযুবক মন্দিরমধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। শিরে তাহার কুঞ্চিতাগ্র দীর্ঘ কেশদাম গুচ্ছে গুচ্ছে স্কন্ধ চুম্বন করিতেছে, উন্নত ললাটে তাহার রক্তচন্দনের লেখা অগ্নিরেখার মত জ্বল্-জ্বল্, বিশালায়ত নয়নে তাহার দিব্য-শান্ত দৃষ্টি, পুষ্ট অনাবৃত বাহুতে তাহার মৌন বীণা! যুবতীর পেলব-লাবণ্য এবং পুরুষের অটল সরলতা যেন তাহার প্রশস্ত দেহে একীভূত হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। সে মূর্ত্তি মানবের? না, দেবতার?

সহসা যুবকের দৃষ্টি বস্ত্রাবকাশ দিয়া আমার পিপাসী নেত্রের উপরে পড়িয়া সচকিত হইয়া উঠিল। কেন জানি না, আমি সে দৃষ্টিকে ব্যথিত করিয়া শিবিকার অন্ধকারে সরিয়া যাইতে পারিলাম না।

আমিও চাহিয়া রহিলাম, যুবকও চাহিয়া রহিল—ক্ষণিকের জন্য। প্রহরী আসিয়া যুবককে সরাইয়া দিল,—যাইবার সময়ে যেন তাহার সমগ্র প্রাণমন নেত্রাগ্রে একাগ্র করিয়া যুবক, আমার দিকে আর একবার চাহিয়া গেল।

বাবা বিশ্বনাথের চরণে, চন্দনচর্চ্চিত বিল্বদল অর্পণ করিয়া, তাঁহাকে প্রণামান্তে আবার শিবিকায় আসিয়া উঠিলাম।

উঠিবার সময়ে চঞ্চলনেত্রে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, কিন্তু আমার বুভুক্ষুহৃদয়, যে রত্নের সন্ধান করিতেছিল, তাহা ত মিলিল না !

জনতা মথিত এবং ভিখারীদলকে মুখর করিয়া শিবিকা অগ্রসর হইতেছিল। চারিদিকে বিশ্বনাথের মহান্ নামে ভক্তের হৃদয় ভক্তিস্তোত্রে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল ; কিন্তু সে উচ্ছ্বাস আমার স্বপ্নাচ্ছন্ন চিত্তকে প্রীত ও স্পর্শ করিতে পারিল না—আমার অন্তর মধ্যে ভাব-সাগরে তখন ঢেউ উঠিয়াছে ! এমন সময়ে আমার সজাগ শ্রবণে এক পরিচিত প্রিয়স্বর ধ্বনিয়া উঠিল—

"তেরি নয়না যাদু ডারা !"

* * * *

মানমন্দিরেই মহারাজ, আমার জন্য বিস্তৃত কক্ষ সাজাইয়া দিয়াছিলেন। অভিভূত হৃদয়ে অসুস্থতার ভাণ করিয়া শয্যায় আশ্রয়গ্রহণ করিলাম। শুইয়া শুইয়া তাহারই কথা ভাবিতে লাগিলাম। মন, অন্যদিকে ফিরাইবার জন্য কত চেষ্টা করিলাম। কিন্তু আমার নিখিল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া, নিভৃত মানস-নেপথ্যে মন্দিরপথদৃষ্ট সেই তরুণসুন্দর মুখখানিই বারংবার জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

পরদিন বৈকালে, দাসী আমার কবরী রচনা করিয়া

দিতেছিল। আমি শূন্যদৃষ্টিতে ওপারে,—যেখানে ধবল সিকতাশয়নের উপরে গঙ্গা আপন জলবেণী লুটাইয়া দিতেছিল, সেইদিকে চাহিয়াছিলাম ; এমন সময়ে, আবার সেই কণ্ঠস্বর !

তাড়াতাড়ি উঠিয়া গবাক্ষ-সমীপে গিয়া দাঁড়াইলাম ! দেখিলাম, নীচে গঙ্গাতরঙ্গচুম্বিত সোপান-চত্বরে বসিয়া বীণাহস্তে সেই যুবক !

যুবকও আমাকে দেখিল। তাহার আনন ঈষৎ আরক্ত, তাহার স্বর ঈষৎ কম্পিত হইয়া উঠিল। তারপর যে গান গায়িতেছিল, তাহা থামাইয়া সে ভিন্ন রাগিণী ধরিল।

সে গায়িতে লাগিল :—

"আঁধারের ভিতরে দুটি আঁখি দেখিয়াছি। সে যুগল আঁখির দীপ্তি দেখিয়া মনে হইল, মেঘের কালো নিকষে বিজলীর স্বর্ণ-আলিপনা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"ফুলের রং যেমন ভিতর হইতে ধীরে ধীরে বিকসিত হয়, সে দুটি নয়নের উপরে হৃদয়ের গোপন ভাষা তেমনই বিলিখিত হইয়াছিল।

"বসন্তের নীরব ইঙ্গিত বুঝিয়া কোকিল যেমন পঞ্চমে সাড়া দেয়, ওগো কমল-নয়না, তোমার আঁখিপটলিখিত হৃদয়ের মৌনভাষা বুঝিয়া আমার চিত্ত-সারং তেমনি করিয়াই সাড়া দিয়া উঠিতেছে।"

আমি দাসীর দিকে ফিরিলাম। আমার আকস্মিক আচরণ দেখিয়া সে বিস্মিত হইয়াছিল।

যুবকের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে নিম্নকণ্ঠে কহিলাম, "উহাকে সকলের চোখের আড়ালে এখানে আনিতে পারিস্ ?"

দাসীর উপরে আমার যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল। কিন্তু আমার কথা শুনিয়া তাহার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল।

আমি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া আবার কহিলাম, "কি বলিস্ ? পারিবি ?"

"মহারাজ জানিলে আমার মাথা কোথায় থাকিবে ঠাকুরাণী ?"

"তোর মাথা তোর কাঁধের উপরেই থাকিবে। মহারাজ এখন আসিবেন না। বল্—পারিবি বাঁদী ? হাজার আশ্‌রফি বখ্‌শীষ।"

খানিক ইতস্ততঃ করিয়া সে স্বীকার পাইল।

* * * *

অট্টালিকার গুপ্তদ্বার, আমাদের মিলন-সাধন করিয়া দিল।

যুবক আমার সাম্‌নে,—আমি তার সাম্‌নে। চারিদিক স্তব্ধ। শুধু ভাগীরথীর অবিরাম কলতানে আমাদের মিলনের উৎসব-সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছিল।

যুবক আমার মুখ দেখিতেছিল,—আমি তার মুখ দেখিতেছিলাম। উভয়ে নীরব। আকাশের বাতাস আসিয়া আমাদের প্রাণের সুপ্ত তন্ত্রীগুলিতে জাগরণের মধুর আভাস আনিয়া দিতেছিল।

যুবক বলিল, "আজ আমার জীবন সার্থক।"

আমি বলিলাম, "আজ আমার নারীজন্ম ধন্য।"

* * * *

অকস্মাৎ ঘরের দরজা খুলিয়া গেল। বিবর্ণমুখে ছুটিয়া আসিয়া দাসী কহিল, "মহারাজ আসিতেছেন! মহারাজ আসিতেছেন!"

মহারাজ!

আমার পায়ের তলা হইতে মাটী যেন চকিতে সরিয়া গেল, আমার চোখের সুমুখ হইতে পৃথিবীর আলো যেন নিবিয়া গেল।

আমি কাঁপিতে কাঁপিতে গবাক্ষের পর্দ্দার একদিকটা তুলিয়া, তাহার আড়ালে যুবককে ঠেলিয়া দিলাম। তারপর তাড়াতাড়ি বিছানার উপর গিয়া বসিয়া, কোনরূপে একটু আত্মসংবরণ করিয়াছি মাত্র,—এমন সময়ে হাস্যমুখে মহারাজ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

আমার ডানহাতটি আপন মুষ্টিমধ্যে গ্রহণ করিয়া, মহারাজ

স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, "পিয়ারী, তোমার কাছ থেকে দুদণ্ড দূরে থাকিয়া আমার মনে হইতেছিল, আমি একযুগ তোমাকে ছাড়িয়া আছি ।"

বিপদ্ভীত দৃষ্টিকে যথাসম্ভব কোমল করিয়া আমি বলিলাম, "মহারাজ, দাসীর প্রতি আপনার অপার করুণা ।"

আমার অনাবৃত গণ্ডে সপ্রেমে একটি চুম্বন করিয়া মহারাজ বলিলেন, "তুমি আমায় যাদু করিয়াছ ।"

আমি মুখ নীচু করিয়া আঙ্গুলে আঁচল জড়াইতে লাগিলাম। মহারাজ, কিছুক্ষণ আমাকে নিষ্পলকনেত্রে নিরীক্ষণ করিলেন। তাহার পর একটু চঞ্চলতা প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "উঃ ! ঘরের ভিতরে অসহ্য গরম ! একলাটি এমন করিয়া, এখানে তুমি কিরূপে বসিয়া আছ ?" বলিয়া, তিনি গবাক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন।

আমার প্রাণ যেন, হৃদয়ের ভিতরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

মহারাজ জানালার পর্দ্দা সরাইয়া দিলেন। সেখানে, যুবক দাঁড়াইয়াছিল।

বিস্মিত হইয়া মহারাজ, পর্দ্দা তুলিয়াই আবার ফেলিয়া দিলেন। কিছুক্ষণ স্তম্ভিত এবং স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "এ কে ?"

দুই হাতে শয্যার আস্তরণ মুঠার ভিতরে চাপিয়া ধরিয়া আমি বজ্রাহতার মত বসিয়া রহিলাম।

কর্কশকণ্ঠে মহারাজ কহিলেন, "বিশ্বাসঘাতিনী! এতদূর স্পর্দ্ধা তোর! আমার শয়নাগারে পরপুরুষ!"

বদ্ধ কণ্ঠকে প্রাণপণে মুক্ত করিয়া আমি কহিলাম, "দোহাই মহারাজের! উহাকে আমি চিনি না।"

"চিনিস্ না? তবে কিরূপে ও এখানে আসিল?"

"জানি না, মহারাজ! জানি না! ও চোর!"

বাঁ হাতে আবার পর্দ্দা তুলিয়া, মহারাজ ডান হাতে যুবককে ধরিয়া বাহিরে টানিয়া আনিলেন। তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন,—"কে তুই?"

"আমি চোর।"

"কিরূপে এখানে আসিলি?"

"বলিব না।"

"কি!"

"বলিব না।"

"বলিবি না?"

"না।"

মহারাজ হাত বাড়াইয়া ভিত্তিবিলম্বিত একখানি তরবারি গ্রহণ করিলেন। আমি ছুটিয়া গিয়া তাঁহার উদ্যত হস্ত ধারণ

করিলাম। কাতরকণ্ঠে কহিলাম, "মহারাজ, মহারাজ, একটা চোরের রক্তে আপনার পবিত্র অস্ত্র কলঙ্কিত করিবেন না।" তাহার পর যুবকের দিকে ফিরিয়া বলিলাম, "এখানে কিরূপে তুই আসিলি, খুলিয়া বল্।"

বুকের উপরে দুই বাহু রাখিয়া, পাথরে-গড়া মূর্ত্তির মত যুবক এতক্ষণ নিথরভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। আমার সম্বোধনে তাহার সর্ব্বদেহের মধ্য দিয়া তড়িৎ ছুটিয়া গেল। আনত নেত্রের পূর্ণ-দৃষ্টি আমার মুখের উপরে রাখিয়া যুবক অভিভূতকণ্ঠে কহিল, "আমি তুচ্ছ চোর নই,—আমি তোমাকে চুরি করিয়া দেখিতে আসিয়াছি।"

প্রদীপ্ত অগ্নির মত উগ্রমূর্ত্তিতে মহারাজ বলিলেন, "কি !"

একটুও বিচলিত না হইয়া যুবক আনমনে বলিতে লাগিল, "হাঁ, চুরি করিয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি—শুধু তোমাকে সখি, শুধু তোমাকে ! দেবপূজায় তুমি যাইতেছিলে, পথ হইতে লুকাইয়া আমি তোমাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম। তুমি জান না, দেখামাত্র আমার আত্মা তোমার পায়ে বিকাইয়া গিয়াছে। একবার দেখিয়া আমার তৃপ্তি হইল না—তাই সকলের অজ্ঞাতসারে কৌশলে আমি এখানে আসিয়া লুকাইয়া ছিলাম,—আর একবার তোমাকে দেখিব বলিয়া ! আমার দেখা হইয়াছে।

এখন আমি মরিতে পারি। মহারাজ, আপনার প্রিয়তমার কোন দোষ নাই।”

মহারাজ অগ্রসর হইয়া কঠিনস্বরে কহিলেন, “উত্তম! তোকে প্রাণে না মারিয়া, তোর প্রতি আমি এক নূতন দণ্ড দিব। তোর যে পাপ-চক্ষু পরস্ত্রীর পবিত্রতার দিকে কুদৃষ্টিতে চাহিয়াছে, সেই চক্ষু আমি নষ্ট করিব। প্রহরী!” আদেশমাত্র প্রহরী ঘরের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল।

যুবকের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া মহারাজ বলিলেন, “এই হতভাগাকে বাহিরে লইয়া গিয়া, ইহাকে অন্ধ করিয়া ছাড়িয়া দে।”

যুবক নীরবে, হাস্যমুখে সেই ভীষণ দণ্ডাদেশ শ্রবণ করিল। বিনা বাধায় যুবক তাহার সঙ্গে চলিল—গমনকালে আমার দিকে একবার দীনদৃষ্টিতে চাহিয়া গেল। ভগবান্, সে দৃষ্টিতে কি গভীর ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল!

* * * *

পরদিন গভীর রাত্রিতে, নিদ্রাশূন্য গঙ্গার উচ্চ তরঙ্গ-কল্লোলের উপর দিয়া পাগল ঝটিকা বহিয়া বহিয়া যাইতেছিল।

সুষুপ্ত মহারাজের শিথিল বাহুপাশের ভিতরে সহসা আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

দুম্ করিয়া গবাক্ষ-কবাট খুলিয়া গেল এবং বহিঃপ্রকৃতির

বিশ্বব্যাপী হাহাকার, বৃষ্টির ঝাপ্‌টা ও উদ্দাম বায়ুর সঙ্গে সে কাহার আকুলকণ্ঠ আমার ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল? সে কেগো—সে কে?

তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ করিয়া দিতে উঠিলাম। হঠাৎ মেঘের কালো বুক চিরিয়া দেবতার অগ্নিময় ভ্রূকুটী ফুটিয়া উঠিল, সেই ক্ষণিকউজ্জ্বল আলোকে দেখিলাম, ঝড়-বৃষ্টির প্রতি একান্ত উদাসীন হইয়া সোপান চত্বরে বসিয়া সেই অন্ধ যুবক গায়িতেছে :—

"নয়না নহি নিদ গই রে,
নিশিদিন মোরি ছাতিয়ান লাগেও অধীরকো।"

একটা চীৎকার করিয়া তখনই মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেলাম।

* * * *

তাহার পর প্রতি নিশায় তাহার হতাশ সঙ্গীত, তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের মত আমার বুকে আসিয়া বিঁধিত। আমার সকল সুখ,—শান্তি ও আনন্দ, জন্মের মত ঘুচিয়া গেল। আহারে-বিহারে শয়নে-স্বপনে সর্ব্বদাই রহিয়া রহিয়া সেই যুবকের কথাই আমার মনে পড়িতে লাগিল। সেই কাতর মুখ—সেই অন্ধ নেত্র—সেই উদাস গীত! তাহার যাতনা ও হতাশার একমাত্র কারণই ত আমি! তাহাকে বিপদে ফেলিয়া আপনাকে

বাঁচাইবার জন্য পাপিষ্ঠা আমি—অনায়াসে মিথ্যা কথা কহিয়াছি।

ভীষণ যন্ত্রণার ভিতরে অকস্মাৎ একদিন মৃত্যু আসিয়া আমার কমনীয় তনুকে চিতায় সমর্পণ করিল। মরণকালে তাহার গান শুনিয়াছি এবং মৃত্যুর পরেও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া, প্রতি-নিশায় আমার অভিশপ্ত আত্মা সেই সকরুণ সঙ্গীত শুনিয়া আসিতেছে। ঐ শুন, ঐ শুন গো! হে অন্ধ যুবক, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর আর শুনিতে পারি না, ওগো, আর সহ্য করিতে পারি না!”—

ছায়ামূর্ত্তির কথা শেষ হইতে না হইতে হঠাৎ কাহার বিস্মিত কণ্ঠ শুনিলাম, “কোন হ্যায় রে!”

চকিতে আমার আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়া গেল, ধড়্‌মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া দেখি, পূর্ব্ব চক্রবালে ঊষার ললাটিকা জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং একগোছা চাবী হাতে করিয়া মানমন্দিরের দরওয়ান সামনে দাঁড়াইয়া মূঢ়ের মত আমার দিকে চাহিয়া আছে! কক্ষতলে কোথায় সেই ছায়ামূর্ত্তি? আশ্চর্য্য স্বপ্ন!

বিধবা

গঙ্গার ঘাটে জটলা

সেনেদের বাঁধা-ঘাটে পাড়ার মেয়েরা স্নান করিতে আসিয়াছেন। কেহ বৃদ্ধা, কেহ প্রৌঢ়া, কেহ যুবতী, কেহ কিশোরী, কেহ বালিকা।

ঘোষ-গিন্নীর সাম্‌নে তামার টাটে মাটির শিব, পঞ্চপাত্রে গঙ্গাজল, ছোট্ট একটি ঝাঁপিতে ফুল আর বেলপাতা।

ঘোষ-গিন্নী যে পূজা করিতেছিলেন না, তাঁহাকে এমন অপবাদ যে দেয়, সে নিশ্চয়ই চোখের মাথা খাইয়াছে। তিনি অবশ্যই পূজা করিতেছিলেন, তবে তাঁর চোখ-কাণ-মন ছিল ঘাটের জটলার দিকে। একসঙ্গে যদি রথও দেখা যায়, কলাও বেচা হয়, তবে সেটা আর বিশেষ মন্দ কথা কি?

বামুন-দিদি স্নান সারিয়া ভিজা কাপড় নিংড়াইতে নিংড়াইতে যখন ঘরমুখো হইলেন, ঘোষ-গিন্নীর শিব-পূজা তখন আশ্চর্য্যরূপে হঠাৎ সাঙ্গ হইয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি শিবের মাথায় কুশি করিয়া একটু গঙ্গাজল ছিটাইয়া, চারিদিকটা সতর্ক

দৃষ্টিতে একবার দেখিয়া লইয়া বলিলেন, "ও বামুন-দিদি, বলি, চল্লে নাকি ?"

বামুন-দিদি বলিলেন, "হ্যাঁ ভাই, বেলা হল—বৌ-ঝিগুলো ছেলেমানুষ, আমি না গেলে হয় ত হাঁড়িই চড়্‌বে না—ছেলেদের আপিসের ভাত দিতে হবে ত !"

সেনেদের বাড়ীর দিকে আর একবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ঘোষ-গিন্নী, হাতছানি দিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "বলি, শোনই না, কথা আছে।"

ঘোষ-গিন্নীর রকম-সকম দেখিয়া বামুন-দিদির মাথার টনক নড়িল। তিনি ফিরিতে ফিরিতে কহিলেন, "তা বল্ বাপু বল্, কি বল্‌বার আছে বল্।"

ঘোষ-গিন্নী চাপা গলায় বলিলেন, "আর শুনেছ,—সেনেদের বাড়ীতে বিধবা-বিয়ে হবে যে !"

বামুন-দিদি কপালে চোখ তুলিয়া বলিলেন, "কার লো—কার ? নলিনীর ঠাকুমার নাকি ?"

ঘোষ-গিন্নী হাসিয়া ঢলিয়া পড়িয়া বলিলেন, "দিদির কথা শুনে আর বাঁচি না ! ও আমার পোড়া কপাল ! ঠাকুমার কি আর সে বয়স আছে ? তোমাদের নলিনীর গো—নলিনীর !"

বামুন-দিদি ছেলেদের আপিসে যাওয়ার কথা বেবাক্ ভুলিয়া

ঘাটের চাতালে ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন, “এ কথা কার মুখে শুন্‌লি রে?”

ঘোষ-গিন্নী বিনাইয়া বিনাইয়া বলিলেন, “আমার কামিনী যে নলিনীর সই,—আমি যে সব শুন্‌ব, তাতে আর আশ্চর্য্য কি বল! কামিনী কাল সন্ধ্যাবেলা আমাকে ডেকে চুপি-চুপি বল্‌লে, ‘কাউকে বল’ না মা, সইয়ের ফের বিয়ে হবে’—আমি ত গালে হাত দিয়ে একেবারে অবাক্!”—বলিতে বলিতে ঘোষ-গিন্নি সেনেদের বাড়ীর দিকে সন্দিগ্ধ নয়নে আবার চাহিয়া দেখিলেন। ঘাট-সুদ্ধ মেয়ে ততক্ষণে ঘোষ-গিন্নীর ঘাড়ের উপরে হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িয়াছে।

বামুন-দিদি ভাল করিয়া জাঁকিয়া বসিয়া বলিলেন, “তারপর?” তাঁর ভাব দেখিলে বোঝা যায়, ছেলেদের আজ অন্নাভাবে আপিস কামাই গেলেও, তিনি সব কথা না শুনিয়া এখান থেকে এক-পা নড়িবেন না।

ঘোষ-গিন্নী ভিজা চুলগুলা লইয়া, মাথার সাম্‌নের দিকে চূড়া করিয়া ঝুটি বাঁধিতে বাঁধিতে বলিলেন, “কামিনীকে আমি জিজ্ঞেস কর্‌লুম, ‘কে বল্‌লে তোকে?’ কামিনী ফিক্ করে একটু হেসে বল্‌লে, ‘কেন, সই নিজে।’—নলিনী-ছুঁড়ীর বেহায়াপনাটা দেখ একবার! শুন্‌লুম, বিয়ের কথা শুনে অবধি ছুঁড়ী নাকি ধিঙ্গী হয়ে বাড়ীময় নেচে নেচে বেড়াচ্চে।”

বামুন-দিদি নাক শিকায় তুলিয়া বলিলেন, "টাকার দেমাক্ বাছা, টাকার দেমাক! কিন্তু ব'লে রাখ্‌লুম বোন, ধর্ম্মে এত সইবে না। এখনও সূয্যি উট্‌চে, দিন-রাত হচ্ছে!"

যাত্রার বীরপুরুষ যেমনভাবে দু'হাতে ভিড় ঠেলিতে ঠেলিতে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তেম্‌নিভাবেই পুরুত-বৌ এই অবকাশে অগ্রসর হইয়া হাত ও মাথা ঘন ঘন নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "ওমা, যাব কোথা! কালে কালে এ হল কি! যাই. মিন্সেকে বলে' দিই গে, ওদের বাড়ী যেন আর না মাড়ায়।"

ঘোষ-গিন্নী ত্রস্তভাবে বলিলেন, "তা, যা কর তা কর বাছা, আমার নামটি যেন করে বস না। জানত, আমার কামিনী, নলিনীর সই।"

মুখ বাঁকাইয়া পুরুত-বৌ বলিলেন, "অমন স'য়ের মুখে ছাই! তোমার কামিনীকে বলে দাও, ম্লেচ্ছের বাড়ী গেলে তারও জাত্ যাবে।"

ঘোষ-গিন্নী বিরক্ত হইয়া কহিলেন "বালাই, কামিনী আমার তেমন মেয়েই নয়—তার জাত্ যাবে কেন? ওদের বাড়ীর চাল-কলা খেয়ে আর শাঁখ-ঘণ্টা নেড়ে যারা মানুষ, জাত্ যাবার ভয় তাদেরই বেশী—"

পুরুত-বউ বাধা দিয়া খন্‌খনে গলা তুলিয়া বলিলেন,

"চাল-কলা আর শাঁখ-ঘণ্টার খোঁটা, কাকে ঠেস্ দিয়ে বলা হল শুনি ? জাতের ডব্-ডবানি আমাদের আর দেখিও না গো ঘোষ-গিন্নী, দেখিও না। জাত্ রাখ্তেও আমরা— মার্তেও আমরা।"

ঘোষ-গিন্নী বলিলেন, "থাম পুরুত-বৌ, থাম—এখানে দাঁড়িয়ে আর দশ-বাই-চণ্ডীর মত চেঁচিও না!'

মুখঝাম্টা দিয়া পুরুত-বৌ বলিলেন, "চেঁচাব না! কেন চেঁচাব না? আমি কি কোন শতেকখোয়ারীর আটচালায় বাস করি যে, ভয় কর্তে যাব? আ মর! আবার বলা হচ্চে, চেঁচিও না! চেঁচাব—খুব চেঁচাব। আমি জোরগলায় বল্চি, মিন্সেকে দিয়ে সেনেদের আর তোমাদের জাত্ মার্ব, মার্ব, মার্ব—তবে ছাড়্ব।"

আসল কথা চাপা পড়িয়া গেল দেখিয়া বামুন-দিদি ব্যাজার হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "মা, মা! আচ্ছা পুরুত-বৌ, এ যে তোমার অন্যায় বাছা! কেউ ত তোমাকে কিছু বলে নি, গায়ে পড়ে তুমি কোঁদল কর্তে আস কেন গা?"

পুরুত-বৌ আরও উঁচু পর্দ্দায় গলা তুলিয়া বলিলেন, "ও! সব শেয়ালের এক রা! আচ্ছা, মিন্সেকে বলে তোমারও জাত্ মার্ব।"

অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা বলিল, "আচ্ছা, জাত্ মার্তে হয়

বাড়ীতে গিয়ে মের'—এখন একটু থাম, কথাটা ভাল করে শুন্‌তে দাও।"

পুরুত-বৌ বলিলেন, "তোমরাও ঐ দলে? আচ্ছা, মিন্সেকে গিয়ে বল্‌ব, বল্‌ব—এই তিন সত্যি কর্‌লুম, তোমাদের সব্বারই জাত্‌ মার্‌ব তবে ছাড়ব।"

এমন সময়ে দেখা গেল, সেনেদের বাড়ীর ভিতর থেকে একটি যুবতী বাহির হইয়া এই দিকেই আসিতেছেন। বোধ হয়, পুরুত-বৌয়ের মিষ্ট গলার স্বর বাড়ীর ভিতরেও গিয়াছিল।

ঘোষ-গিন্নী থতমত খাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওমা, নলিনী যে!"

বামুন-দিদি চট্‌ পট্‌ উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, "গঙ্গা, গঙ্গা, গঙ্গা! যাই মা, বেলা হল, আপিসের ভাত দিতে হবে।

পুরুত-বৌ গজ্‌-গজ্‌ ও ফোঁস্‌-ফোঁস্‌ করিতে করিতে—বোধ করি, "মিন্সে"র কাছে নালিশ জানাইতেই চলিলেন।

ঘোষ-গিন্নী ততক্ষণে (এবারে চোখ চাহিয়া নয়) ভক্তিভরে. আবার শিবের ধ্যানে বসিয়াছেন। অন্যান্য রমণীরাও—কেহ গঙ্গায় গিয়া ডুব দিলেন, কেহ একান্তমনে কাপড় কাচিতে লাগিলেন, কেহ "বাজার বড় মাগ্যি, চাবুটে ক্ষুদে ক্ষুদে চিংড়ীমাছের ভাগা পাঁচ পয়সা—গেরস্তের দিন চলা

ভার হয়ে উঠ্‌ল দেখ্‌চি"—বলিয়া অতিশয় নিরীহের মত ঘর কন্নার কথা পাড়িলেন।

নলিনী ঘাটে আসিয়া দেখিল, অভিনয় শেষে রঙ্গালয়ের মত সব একেবারে চুপ-চাপ্ হইয়া গিয়াছে। একবার সকলকার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "হ্যাগা, পুরুত বৌ 'জাত্ মারব, জাত্ মারব বলে' চেঁচাচ্ছিলেন কেন?"

কাপড়-কাচা বন্ধ করিয়া একজন যেন আকাশ থেকে পড়িয়া বলিলেন, "কই, আমরা ত শুনিনি বাছা!"

নলিনী বিস্মিতস্বরে বলিল, "সে কি গো, পুরুত-বৌয়ের গলার চোটে আকাশ ফেটে যাচ্ছিল, আর তুমি শোন্ নি কি রকম?"

"জানিনে বাপু, আমরা কারুর সাত-পাঁচে থাকিনি, কে কি বল্লে না বল্লে আমরা তা কি জানি? ঐ ঘোষ-গিন্নীকে জিজ্ঞেস্ কর।"

ঘোষ-গিন্নী তাড়াতাড়ি পূজার জিনিষ-পত্র তুলিতে তুলিতে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "তুমি কেমন মেয়ে গা, কলু-বউ! আমি কচ্ছিলুম পূজো, কে কার জাত্ মারবে, আমি তার কি ধার্ ধারি? মুখ দিয়ে ফস্ করে একটা কথা বলে ফেল্লেই হল!"—বলিতে বলিতে তিনি তাঁর নাদুস্-নুদুস্ মোটা দেহখানি লইয়া, যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, সরিয়া পড়িলেন।

একটি বালিকা নলিনীর কাছে গিয়া বলিল, "হ্যাঁ, নলিনী-মাসী, তুমি নাকি আবার বিয়ে কর্‌বে?

নলিনীর মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। ব্যাপারটা যে কি, সে কথা বুঝিতে আর তার দেরি হইল না। কোন কথা না কহিয়া মুখ নীচু করিয়া আস্তে আস্তে আবার সে ফিরিয়া গেল।

ঘাটের রমণীরা পরস্পরের দিকে চোখ-ঠারাঠারি করিয়া নীরবে হাসিতে হাসিতে এ-উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন। সে হাসি দেখিয়া বোঝা যায়, নলিনীর প্রাণের ব্যথাটা তাঁহারা বেশ ভালরূপেই উপভোগ করিতেছিলেন।

একালের সুসংস্কার

আমরা সবাই গোলাপ-ফুলটিকে চাই—কিন্তু কাঁটা বাদ। সুরেশবাবুও কলিকাতার সুবিধাটুকু ষোল আনা ভোগ করিতে চান; কিন্তু কলিকাতার রাস্তার ধুলা, গাড়ীর ঘড়্-ঘড়ানি আর লোকজনের হট্টগোল সহ্য করিতে একেবারেই নারাজ।

অতএব, কলিকাতার কাছাকাছি গঙ্গার পারেই তিনি বাড়ী তৈয়ারী করাইয়াছেন। কলিকাতার কোন কোর্টের তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁর পিতাও, যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চয় না করিয়া পরলোকে প্রস্থান করিয়া পুত্রকে ইহলোকে বিপদ্‌গ্রস্ত করেন নাই।

বিলাতের মাটী না মাড়াইয়াও যে কতটা পূরো সাহেব হওয়া যায়, তার প্রমাণ দিতে হইলে লোকে সুরেশবাবুর নাম করিত। বাড়ীর ভিতরে বা বাহিরে সুরেশবাবুকে কেউ কখনও বাঙ্গালীর পোষাক পরিতে দেখে নাই। আকারে প্রকারে, আহারে-বিহারে সুরেশবাবু একেবারে 'কেতা'দুরস্ত খাঁটি সাহেব।

সুরেশবাবু বিপত্নীক। বিবাহের ফলে তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা লাভ হইয়াছিল। ছেলের নাম রমেশ, মেয়ের নাম নলিনী।

রমেশ সম্প্রতি বিলাতে গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছে। এখনও ব্যবসায় আরম্ভ করে নাই।

নলিনী বিধবা। বিবাহের এক বৎসর পরেই তার স্বামী মারা যান। "খাও দাও—আনন্দে রহো"—সুরেশবাবুর জীবনে এইটিই মূলমন্ত্র হইলেও নলিনীর ঐ কাতর মুখখানি তাঁহার বুকের ভিতরে সর্ব্বদা একটা খোঁচার মত লাগিয়া থাকিত।

সংসারে আর একটি লোক ছিলেন, তিনি সুরেশবাবুর বৃদ্ধা মাতা। নলিনীর এই ঠাকুরমাটি একেবারে সেকেলে হিন্দুমহিলা; আপনার ঠাকুর-ঘরে বসিয়া সারাদিন তিনি দেবতার সেবা ও পূজা-অর্চ্চনা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন, সন্ধ্যাবেলায় প্রতিদিনই নলিনীর মুখে গলদশ্রুলোচনে রামায়ণ

মহাভারতের অমৃত-কথা শ্রবণ করিতেন। পড়িতে বসিবার আগে নলিনীকে রোজ কাপড় ছাড়িয়া, গা ধুইয়া আসিতে হইত। যে কাপড় পরিয়া নলিনী তার বাপকে ছুঁইয়াছে, সে কাপড়ে ঠাকুরমাকে ছুঁইলে, তিনি তখনই "রাম রাম" বলিয়া গঙ্গায় ডুব দিয়া আসিতেন।

সুরেশবাবু মেয়েকে সকলরকমে নিজের আদর্শমত গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন। আবার, ঠাকুরমা তাহাকে নিজের দলে টানিতেন। তিনি বলিতেন, "দেখ্ মা নলিনী, তুই হিন্দুর ঘরের বিধবা, বাপের কথায় যেন ম্লেচ্ছ আচার শিখিস্ নি। ঠাকুর তা হলে রাগ করবেন।"—নলিনী, হাসিয়া ঠাকুরমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিত, "না ঠাকুরমা, আমি তোমার কথা শুনব।"

এই দোটানায় পড়িয়া নলিনীর চরিত্রে একাল-সেকালের অপূর্ব্ব মিলন হইয়াছিল। বাপের যত্নে একালের শিক্ষিতা মহিলার মত সে বিদুষী হইয়া উঠিয়াছিল; আবার ঠাকুরমার সংস্কার ও প্রভাবও তাহার জীবনের পরতে পরতে মিশিয়া গিয়াছিল। ফলে, সে তার বাপকেও খুসি রাখিত, ঠাকুরমাকেও খুসি রাখিত।

* * * *

রমেশের সহপাঠি অমিয়কুমার ছেলেবেলা হইতেই

সুরেশবাবুর বাড়ীতে আসা-যাওয়া করিত, এমন সুশ্রী পুরুষ বাঙ্গালীর ভিতরে বড় একটা দেখা যায় না।

রমেশের সঙ্গে অমিয়ও বিলাতে গিয়াছিল,—ডাক্তারী পড়িতে। অল্পদিন হইল, সে দেশে ফিরিয়াছে। অমিয় অবিবাহিত।

বিলাত হইতে ফিরিয়া প্রথম যেদিন শ্বেতবসনা নলিনীকে দেখিল, সেদিন সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। নলিনীকে দেখিয়া গিয়াছিল সে চপলা কুমারীর বেশে, বাতাসে উড়ন্ত ফুলের একটি পাপ্‌ড়ির মত, তখন সে মনের খুসিতে বাড়ীময় ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইত,—আর আজ, সেই হাস্যময়ী চঞ্চলার একি রূপ, একি বেশ! এই দু'দিনের ভিতরে সংসারের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে তাহার মুক্ত সুখের নির্ঝর একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে? অমিয়ের চোখ সজল হইয়া উঠিল,—সে প্রথমে কোন কথাই কহিতে পারিল না।

নলিনী তাহাকে নমস্কার করিয়া বলিল, "ভাল আছেন ত অমিয়বাবু? আপনার চেহারা যে একেবারে বদ্‌লে গেছে!"

অমিয় জোর করিয়া মুখে হাসি আনিয়া বলিল, বদ্‌লে গেছে! কি রকম বল ত!"

নলিনী বলিল, "বিলেত যাবার আগে আপনি বেশ ছেলেমানুষটির মত দেখ্‌তে ছিলেন; আর এখন—"

"একেবারে জোয়ান পুরুষ-মানুষ হয়ে উঠেচি—না নলিনী ? ভগবান্ এম্‌নি করে ছেলেকে যুবা আর যুবাকে বুড়ো করে চিরকালই খেলায় মেতে আছেন—মানুষ বড় হইলেই যুবা হয়, নাকের তলায় গোঁফ গজায়, মাথায় লম্বা হয়ে ওঠে—উঃ! সৃষ্টির কি ভীষণ হেঁয়ালি! কিন্তু তোমার আমার ত আর এতে কোন হাত নেই, কি কর্‌ব বল, এজন্যে আমি আন্তরিক দুঃখিত।"

নলিনী হাসিয়া বলিল, "অমিয়বাবু, চেহারা বদ্‌লালেও আপনার কথা কইবার ধরণটুকু একেবারেই বদ্‌লায় নি।"

অমিয় বলিল, "এককথা বল্‌লে দশকথা শুনিয়ে দি ? হাঁ—ও রোগটা আমার বরাবরই আছে—তবে আশা করি, বরাবর থাক্‌বেও।"

"আচ্ছা অমিয়বাবু, বিলেত কেমন জায়গা ?"

"সেকথা ত আমাদের এক কবি প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন, 'বিলেত দেশটা মাটির, সেটা সোণা-রূপোর নয়, তার আকাশেতে সূর্য্য ওঠে, মেঘে বৃষ্টি হয়,' ব্যস্! এই দু'লাইনেই বিলেতের অবিকল 'ফোটো'। তবে কিনা, তফাৎ কিঁ জান ? সে দেশের মেয়েরা তোমার মতন এমন শাদা কাপড় পরে, এমন মুখ শুকিয়ে থাকে না—একটু থামিয়া,

গম্ভীর হইয়া অমিয় বলিল, "নলিনী, তোমাকে এমন দেখ্‌তে হবে, এটা কখন স্বপ্নেও মনে করি নি।"

নলিনী মুখ ফিরাইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল! তাহার পর বলিল, "অমিয়বাবু, ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা কর্‌বেন না?"

অমিয় বলিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ,—ঠাকুরমার ঠাকুরের প্রসাদ অনেক খেয়েছি,—তাঁর সঙ্গে দেখা না কর্‌লে মস্ত অকৃতজ্ঞতা হবে। চল।"

ঠাকুরমা, তখন ঠাকুর-ঘরে বসিয়া নৈবেদ্যের চাল সাজাইতেছিলেন। অমিয় ঠাকুরমার শুচিবাইএর কথা জানিত। তাই সে বাহির হইতেই ডাকিল, "ঠাকুরমা— অ-ঠাকুরমা।"

অমিয়ের গলা শুনিয়াই ঠাকুরমা ধড়্‌-মড়্‌ করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কে রে, 'ওমে' এলি নাকি? কেমন, ভাল আছিস্‌ ত?"

অমিয় বলিল, "তোমায় প্রণাম কর্‌তে এসেছি ঠাকুরমা! হুকুম দাও—ঘরে ঢুকে পা ছুঁয়ে দণ্ডবৎ হয়ে ভক্তিভরে প্রণাম কর্‌ব, না এইখানে দাঁড়িয়ে তফাৎ থেকেই প্রণামটা আল্‌গোছে সেরে নেব?"

ঠাকুরমা তাড়াতাড়ি দরজার কাছে আসিয়া ব্যস্তভাবে

বলিলেন, "না বাবা, ঘরে আর ঢুকতে হবে না, ঐখান থেকেই কর, ঐখান থেকেই কর।"

"যো হুকুম"—বলিয়া অমিয় ঠাকুরমাকে প্রণাম করিল।

"বেঁচে থাক বাবা, চিরঞ্জীবী হও; সংসারে আমাদের দিন ত ফুরিয়ে এসেছে, এখন তোমরা ঘর-সংসার পেতে, বিয়ে-থা করে' সুখে-স্বচ্ছন্দে থাক—মা-কালী যেন এই করেন।"

অমিয় বলিল, "সে কি ঠাকুরমা, তোমার দিন ফুরুবে কেন? বালাই, মা-কালী তোমার জন্যে এত শীঘ্র যদি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, তা হলে তিনি ভুল কর্‌বেন। দাঁড়াও, আগে তোমার রমেশের একটি টুক্‌টুকে রাঙ্গা বউ দেখ, তার নাতি দেখ।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "না বাবা, তা আর দেখ্‌তে চাই না, এখন তোমাদের রেখে যেতে পার্‌লেই বাঁচি।"

"যেতে পার্‌লে ত বাঁচ,—কিন্তু তোমাকে ছাড়ে কে? রমেশের নাতির বিয়েটা দেখ।"

"না বাবা, তোমার অমন কামনায় আর দরকার নেই।"

"উঁহু! রমেশের নাতির খোকাকে দেখ্‌বে—"

"না বাবা—"

"সেকি হয়, নাতির নাতি দেখ্‌লে স্বর্গে দেদার বাতি জ্বলে, জান ত?"

রমেশ বলিল, "আপনি কি জিজ্ঞাসা করছেন? 'বিধবার বিবাহ দেওয়া উচিত কি অনুচিত,—এই ত?"

"হ্যাঁ।"

"আমার বিশ্বাস দেওয়া উচিত। বিশেষ, আমাদের দেশে।"

"কেন?"

"এদেশে বিধবার জীবন,—লক্ষ্যশূন্য জীবন। সংসারের একজন হয়েও তিনি সংসারের বাইরে থাকেন। আমরা তাঁকে মানুষ বলে' জানি; কিন্তু তাঁকে মানুষের অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখি। এখানে বালিকা-বিধবাকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করানো হয়; কিন্তু সেই বালিকার সামনে বসে তার বৃদ্ধ পিতা-মাতা জীবনকে যতটা পারেন, হাসিমুখে ভোগ করে নেন।"

সুরেশবাবু চুপ করিয়া কিছুকাল বসিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "আচ্ছা রমেশ, নলিনীর যদি আবার বিবাহ দি, তা হলে তোমার কোন আপত্তি-টাপত্তি আছে?"

তাহার পিতা যে এই কথা বলিবেন, রমেশ তাহা তাঁহার কথা কহিবার ধরণ-ধারণ দেখিয়া আগে থাকিতেই আন্দাজ করিতে পারিয়াছিল। এদিকে তারও একটা আন্তরিক ইচ্ছা ছিল; কিন্তু ভরসা করিয়া এতবড় কথাটা সে পিতার সুমুখে

তুলিতে পারে নাই। সে পুলকিত হইয়া বলিল, "আমার এতে কোন অমত নেই বাবা!"

"দেখ, নলিনীর জন্যে দিন-রাত আমার মনে শান্তি নেই—তার শুষ্কমুখ দেখ্‌লে আমার বুকের রক্ত জল হয়ে যায়। অনেক ভেবে চিন্তে তবে আমি ঠিক করেছি যে, নলিনীর আবার বিবাহ দেব। এতে তোমারও মত আছে জেনে আমি সুখী হলাম;—কিন্তু এখন একটা কথা। বিধবা বলে ত নলিনীকে যার তার হাতে সঁপে দিতে পারি না—ভাল পাত্র না পেলে তার বিবাহ কিছুতেই দেব না; কিন্তু তেমন পাত্র পাই কোথায়?"

রমেশ বলিল, "আচ্ছা বাবা, অমিয় যদি নলিনীকে নিতে রাজী হয়, তা হলে আপনার কোন অমত হবে কি?"

সুরেশবাবু বলিলেন, "অমিয়! বল কি! এমন ভাগ্য কি আমার হবে?"

রমেশ বলিল, "কেন অমিয়ের অমত হবার কারণ দেখ্‌ছি না। নলিনীর মত শিক্ষিতা আর সুন্দরী স্ত্রী কি যার-তার ভাগ্যে ঘটে? বিশেষ, অমিয়ের বাপ-মা নেই, সে একেবারে স্বাধীন; সুতরাং সেদিকে থেকেও কেউ তাকে বাধা দেবে না। আর তার নিজের কথা যদি ধরেন, আমি তা হলে বল্‌তে পারি, তার কোন রকম কুসংস্কার নেই।"

সুরেশবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "বেশ, তুমি তাহলে অমিয়ের মতামত জেনে এস। অবশ্য, এ বিবাহ হলে আমাদের আত্মীয়-স্বজনেরা চটে যাবেন ; কিন্তু, কি করব, তাঁদের খুসী রাখ্‌বার জন্যে ত ঐ নির্দ্দোষ মেয়েটার সারা জীবন নষ্ট করে দিতে পারি না। আর এক বিপদ হবে, আমার মাকে নিয়ে ; কিন্তু সেকেলে বুড়ীদের কুসংস্কার মেনে চল্‌তে গেলে সংসারটা পদে পদে অচল হয়ে উঠ্‌বে। যাক্—যাই হোক্ তাই হোক্—এ বিবাহ আমি দেবই দেব।"

আলো ও ছায়া

নলিনী যখন কথাটা শুনিল, তখন তার প্রাণ-মন হঠাৎ কেমন একটা অজানা বিদ্রোহী ভাবে অভিভূত হইয়া গেল।

আমার বিবাহ! আপনার পোড়াকপালের কথা ভাবিয়া সে অনেক দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছে ; কিন্তু তার মনের ব্যথা স্বুধু মনই জানিত, সে গভীর ব্যথার কথা ত ঘুণাক্ষরেও বাহিরে প্রকাশ পায় নাই! সে বিধবার জীবন যাপন করিতেছিল, বিলাসিতাকে সকল দিক্ দিয়া পরিহার করিয়া চলিতেছিল ; তার যে আবার বিবাহ হইবে, সেটা যে সম্ভব, এমন ব্যাপার সে স্বপ্নেও কোনদিন কল্পনা করে নাই।

কথাটা শুনিয়াই তার মন যেন ঘৃণাভরে বলিয়া উঠিল,

"না, না, না!"—তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল—তখনই সে ছুটিয়া গিয়া পিতার দুটি পায়ে পড়িয়া বলে, "ওগো সে হবে না, সে হবে না, বাবা, সে হবে না।"—কিন্তু সে পিতার দৃঢ়তা জানিত। বুঝিল, এমন অনুরোধে তাহার নিজের লজ্জাহীনতাই প্রকাশ পাইবে,—পিতা তাহার কাকুতিতে কর্ণপাতও করিবেন না।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। পশ্চিমের জ্বলন্ত রবি-চিতার আকাশভরা আলো অনেকক্ষণ নিবিয়া গিয়াছে, দু-চারিটা দলছাড়া বক তখনও তাড়াতাড়ি উড়িয়া যাইতেছিল এবং রহিয়া রহিয়া দূর মন্দির হইতে আরতির শঙ্খ কাঁসরের গম্ভীর নিনাদ এলোমেলো বাতাসে ভাসিয়া ভাসিয়া আসিতেছিল। অস্পষ্ট ছায়ালোকে সঙ্গীতমুখর গঙ্গার ও-পারের গাছ-পালার সবুজ রঙের সঙ্গে একটু একটু করিয়া অন্ধকার জমাট বাঁধিতেছিল। একখানা পানসী সাদা পাল তুলিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল,—তাহার দাঁড়ী মাঝীগুলাকে দেখাইতেছিল, ঠিক যেন জীবন্ত ছবির মত! নলিনী বাষ্পাকুল চোখে সেইদিকে তাকাইয়া রহিল; তাহার উদাসী মন যেন ঐ পানসীখানার সঙ্গে-সঙ্গে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে ছুটিয়া যাইতে চাহিল।

অনেকদিন আগেকার এক শুভদিনের কথা তাহার স্মরণ হইল,—আলো আর হাসি আর গানের মাঝে যেদিন এক

নবীন অতিথি আসিয়া নিজের জীবনের সহিত তাহার জীবনকে এক করিয়া দিয়াছিল। হায় রে, অকাল শীতের উদয়ে সে বসন্তের পাখী আজ মৌন হইয়াছে বটে,—কিন্তু দুদিনের তরে ডাকিয়া তাহার সারা জীবনকে সে যে বিচিত্র রাগিণীতে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়া গিয়াছে, আর কি তাহা ভোলা যায় গো, আর কি ভোলা যায়? সেই মুখ, সেই চোখ, সেই হাসি! শ্মশানের নিষ্ঠুর চিতা তাহা স্পর্শ করিতেও পারে নাই, নলিনীর স্মৃতির তীর্থে আজও তাহা স্বর্ণ রেখায় তেমনই উজ্জ্বল হইয়া আছে,—নির্ব্বোধ পৃথিবী, নির্দ্দয় সংসার এ সত্য বুঝিতে পারে না কেন, কেন পারে না? জীবনে জীবনে, জন্মে জন্মে, ইহলোকে পরলোকে দেবতা সাক্ষী করিয়া চিরসম্বন্ধ যাহার সঙ্গে,—ছার রক্ত মাংসের তুচ্ছ উপভোগের জন্য আজ কি সে সম্বন্ধকে অস্বীকার করিতে হইবে?—নলিনী ভাবিতে লাগিল।

বাহির হইতে রমেশ ডাকিল, "নলি, ঘরে আছিস্?"

নলিনীর সাড় হইল। তাড়াতাড়ি চোখের জল আঁচলে মুছিয়া সে উত্তর দিল, "দাদা ডাকচ?"

"হ্যাঁ, বাইরে চল্—অমিয় এসেছে।"

নলিনীর বুকটা ধড়্‌-ফড়্‌ করিয়া উঠিল। বুকে হাত দিয়া খানিকটা সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর বলিল, "দাদা, আমার বড় মাথা ধরেচে, বাইরে যেতে ইচ্ছে করচে না।"

"মাথা ধরেচে ত ঘরের ভিতরে বন্ধ হয়ে আছিস কেন ? ওতে যে অসুখ বাড়্‌বে ! আয়, আয়—বাইরে আয় ।"

নলিনী ক্ষীণস্বরে আরও দু-চারবার আপত্তি জানাইল ; কিন্তু রমেশের জেদের কাছে তাহার কোন আপত্তিই টিকিল না। অগত্যা তাহাকে দরজা খুলিয়া অপ্রসন্ন মনে রমেশের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইল ।

বাহিরের ঘরে গিয়া সে দেখিল, অমিয় একেলা বসিয়া আছে। নলিনী ঘরে ঢুকিতেই অমিয়ের চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ।

সে হাসিয়া বলিল, "এই যে নলিনী, কখন থেকে তোমার জন্যে হা-পিত্যেস্ করে বসে আছি, কিন্তু তুমি যে দেখ্‌চি বেঁটে লোকের কাছে উঁচু দরজার শিকলির মত একান্ত দুর্লভ হয়ে উঠেছ !"

উত্তরে নলিনী হাসিবার চেষ্টা করিল,—চেষ্টামাত্র ; কিন্তু সে চেষ্টায় তার মুখে হাসির চেয়ে কান্নার ভাব্‌টাই বেশীমাত্রায় প্রকাশ পাইল। সে এতদিন অমিয়ের সঙ্গে অসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা কহিয়া আসিয়াছে,—আজ কিন্তু কথা কওয়া দূরে থাক, অমিয়ের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতেই তার ঘাড় যেন নুইয়া নুইয়া পড়িতেছিল ।

অমিয় বলিল, "নলিনী, আজ যে দেখ্‌চি তুমি মিশরের

'স্ফিংক্সে'র চেয়েও, পাথরের প্রতিমার চেয়েও বেশী নীরব! ব্যাপার কি?"

রমেশ বলিল, "নলির আজ ভারি মাথা ধরেছে। ও ত কিছুতেই আস্‌বে না, আমি একরকম জোর করে ধরে নিয়ে এসেচি।"

অমিয় বলিল, "তুমি অতিশয় পাষণ্ড, রমেশ! না নলিনী, তোমার শরীর যদি ভাল না থাকে, তবে তুমি ভেতরে যাও। (নলিনী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল) দাঁড়াও, আর একটা কথা।"

নলিনী কোন রকমে বলিল, "কি?"

অমিয় সুমুখের টেবিলের উপর হইতে একখানা চক্‌চকে, নূতন বাঁধান' বই তুলিয়া লইয়া বলিলেন "নলিনী, আমার একখানা কবিতার বই বেরিয়েছে। যে দেবীর নামে বইখানা উৎসর্গ করা হয়েছে, সে দেবী যদি প্রসন্না হন, তবে আমার কলম ধরা সার্থক।" বলিয়া, অমিয় বইখানি নলিনীর হাতে দিল।

বইখানি হাতে করিয়া লইবার সময়ে নলিনী, দেখিল, অমিয় কাতর অথচ মধুর মিনতিভরা চোখে তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। সে দৃষ্টি যেন তীরের ফলার মত নলিনীর প্রাণের মাঝখানে গিয়া বিঁধিল; বইখানা লইয়া সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

আপনার ঘরে গিয়া নলিনী মেঝের উপরে বসিয়া পড়িল। তাহার বুক তখনও ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে তার বুকের কাঁপন থামিল। তখন সে আস্তে আস্তে অমিয়ের বইখানা লইয়া পাতা উল্টাইতে লাগিল। প্রথম দুই পৃষ্ঠা উল্টাইতেই দেখিল, উৎসর্গ-পত্র। সেখানে বড় বড় হরফে লেখা রহিয়াছে :—

"স্নেহ ও ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ আমার এই কবিতাগুলি শ্রীমতী নলিনী দেবীর নামে উৎসর্গ করিলাম।"

উৎসর্গ-পত্রের দিকে নলিনী শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে সে বইখানা হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরের এককোণে কেরোসিনের উজ্জ্বল 'ল্যাম্প্ জ্বলিতেছিল। নলিনী কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া বইখানা চিমনির উপরে ধরিল।

অমিয়ের সাধের উপহার লইয়া নলিনী অগ্নিদেবকে উপহার দান করিল। অগ্নিদেব সর্ব্বভুক্—এ উপহারে তাঁহার অরুচি হইল না।

* * * * * *

বুড়াবয়সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঠাকুরমার চোখ বুঝি গেল।

যেদিন থেকে নলিনীর বিয়ের কথা শুনিয়াছেন, সেইদিন থেকে তিনি যেন পাগলের মত হইয়া উঠিয়াছেন।

ছেলেকে তিনি অনেক বুঝাইলেন, তাহার কাছে অনেক কান্নাকাটি করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার প্রাণের বেদনা সে ত কিছুতেই বুঝিল না!

চোখের জল মুছিতে মুছিতে ঠাকুরমা বলিলেন, "তবে আমাকে কাশীতে পাঠিয়ে দে বাবা! আমি থাক্‌তে সংসারে এতবড় অধর্ম্ম কখনই ঘটতে দেব না।

'হ্যাভানা' চুরুটে একটা টান দিয়া সুরেশবাবু বলিলেন. "সে ভাল কথা। তোমাকে আমি কাশী পাঠাতেও রাজি আছি মা, কিন্তু নলির বিয়ে বন্ধ কর্‌তে কোনমতেই রাজি নই।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "আচ্ছা, আমি অমিয়কে একবার বলে কয়ে দেখ্‌ব, আমার কথায় হয় ত নলিকে সে বিয়ে না কর্‌তেও পারে।"

সুরেশবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "সে সব কিছু ক'র না মা, তাতে কোন ফল হবে না। অমিয় যদি নারাজ হয়, আমি তা হলে অন্যত্র নলির বিয়ে দেব।"

ঠাকুরমা হতাশ হইয়া চলিয়া গেলেন। ঠাকুর-ঘরে গিয়া কুলদেবতার উদ্দেশ্যে তিনি যোড়হাতে কাতরে বলিলেন, "হে

ঠাকুর, সুরেশের মতি-গতি ফিরিয়ে দাও, সংসারে এতবড় পাপকে ঢুক্‌তে দিও না, হে মা কালি, হে মা দুর্গা!"

ঠাকুরমা যে বংশের মেয়ে, সে বংশ সতীত্বের খ্যাতির জন্য বিখ্যাত। ঠাকুরমার দিদিমা স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গমন করিয়াছিলেন। কেমন করিয়া সেই পরমা সতী আত্মীয় স্বজনের কোন মানা না মানিয়া অটল পদে, একমাথা সিন্দূর ও সর্ব্বাঙ্গে গহনা পরিয়া হাসিতে হাসিতে চিতায় গিয়া উঠিয়াছিলেন, নলিনীর কাছে ঠাকুরমা কতবার উজ্জ্বল ভাষায় সেই বর্ণনা বর্ণন করিয়াছেন। ঠাকুরমার মাও বিধবা হইবার পর 'তেরাত্রি' পোহাইতে না পোহাইতে বিনা অসুখে কেবল মনের জোরে, প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। সে সব পুণ্যকথা বলিতে বলিতে ঠাকুরমার চোখ দিয়া ঝর্‌-ঝর্‌ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িত। "এমন বংশের রক্ত যার দেহে আছে, সেই কি না আজ বিধবার বিয়ে দিতে চায়! হে হরি, হে দয়াময়, সুরেশকে সুমতি দাও ঠাকুর, আমি থাক্‌তে তার যেন এ দুর্ম্মতি না হয়!"

* * * * *

সেদিন গঙ্গার ঘাটে নলিনী যে কানাকানির আভাস পাইয়া আসিয়াছিল, সে কথাগুলা ক্রমে বড় হইয়া, তাহার কাণে প্রবেশ করিল। নলিনী শুনিল, পাড়ার বুদ্ধিমতীরা স্থির করিয়াছেন, এই বিবাহে সকলকার চেয়ে বেশী আগ্রহ,

নলিনীর। কথাগুলা শুনিয়া লজ্জায় যেন নলিনীর মাথা-কাটা যাইতে লাগিল। মুখে যারা হাসিয়া কথা কয়, বন্ধুত্ব জানায়, সুযোগ পাইলে তাহাদের জিভ্ যে কতটা নিষ্ঠুর হইয়া উঠিতে পারে, নলিনী সেদিন তাহা বেশ বুঝিতে পারিল।

এদিকে সুরেশবাবু বিবাহের দিন স্থির করিয়া ফেলিলেন।

রমেশ ঠিক করিল, বিবাহের আগে একবার নলিনীর মতটা জানা দরকার। তাই, সেদিন বৈকালে যখন অমিয় তাহাদের বাড়ীতে আসিল, রমেশ তখন বলিল, "দেখ অমিয়, নলিকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখ দেখি, এ বিবাহে তার মত আছে কি না।"

অমিয় বলিল, "না ভাই, ও-কাজটার ভার তোমরা কেউ নিলেই ভাল হয়। নলিনী যতই লেখা পড়া শিখুক, সে বাঙ্গালার মেয়ে;—সে যদি বিড়ালাক্ষী মেরি হোত, তা হলে আমি 'প্রপোস্ করতে পারতুম। মিছামিছি বেচারীকে লজ্জা দিয়ে লাভ কি ?"

রমেশ বলিল, "না না, সে যখন তোমার পত্নী হবে, তখন তোমার পক্ষে বিবাহের আগে ভাল করে তাকে বোঝা দরকার। তুমি বোস, আমি নলিকে ডেকে আনছি।"

অল্পক্ষণ পরেই নলিনীকে সঙ্গে করিয়া রমেশ ফিরিয়া

আসিল। নলিনী অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে টেবিলের সাম্‌নের একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

অমিয় বলিল, "কেমন আছ, নলিনি? আজ ত তোমার মাথা ধরে নি?"

নলিনী সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, "না।"

টেবিলের উপরে একখানা বাঙ্গালা মাসিক পত্র পড়িয়াছিল, নলিনী হেঁট হইয়া অন্যমনস্কভাবে তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিল। এক জায়গায় একখানা ছবি রহিয়াছে, নাম 'বিধবা'। বিবাহ-বাড়ী, চারিদিকে হাসিমাখা মুখ। 'এয়ো'রা সাজগোছ করিয়া, কেহ শাঁখ, কেহ বরণ-ডালা, কেহ থালা লইয়া বর-কন্যাকে ঘিরিয়া উৎসবানন্দে মাতিয়া আছেন,—কাহারও মুখে বিষণ্ণতার চিহ্নমাত্র নাই।—এদিকে আঙ্গিনার পাশে অন্ধকার ঘরে, মলিন শ্বেতবাস পরিয়া, এক নিরলঙ্কারা বিধবা যুবতী একাকী দাঁড়াইয়া, কাতর চোখে বাহিরের সেই বিবাহ-সমারোহের দিকে তাকাইয়া আছেন। হায়, ঐ উৎসবের মধ্যে তাঁহার প্রবেশাধিকার নাই, তাঁহার স্পর্শে নবদম্পতীর অকল্যাণ হইবে!

নলিনী আগ্রহের সহিত ছবিখানি দেখিতে লাগিল।

এই অবসরে রমেশ ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল,—নলিনী কিছুই জানিতে পারিল না।

অমিয় বসিয়া বসিয়া নলিনীর মুখের দিকে—ভক্ত যেমন করিয়া প্রতিমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, তেমনই করিয়া—চাহিয়া রহিল।

নলিনী তাহার সুমুখে কখনও মাথায় কাপড় দিত না—আজও দেয় নাই। সে তার কালো চুলগুলিকে এলাইয়া দিয়াছে,—কতক চুল তার পিঠে, কতক বুকের উপরে, কতক-বা কাঁধের উপরে আসিয়া ঘুমন্ত সাপের মত এলাইয়া আছে। পরণে তার থান্-কাপড়,—সেই শ্বেতবস্ত্রে তাহার সৌন্দর্য্যের দীপ্তি ও পবিত্রতা যেন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল!

বিলাত যাইবার আগে অমিয় যখন নলিনীকে দেখিয়া গিয়াছিল, তখন তাহার বয়স কৈশোর ও যৌবনের মাঝামাঝি; কিন্তু ভরা যৌবন আসিয়া নলিনীর সেই ফুটন্ত দেহলতাকে এখন অপূর্ব্ব শ্রী-ছাদে বসন্তের নবীন মালঞ্চের মত পূরন্ত ও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। নলিনীর সুডৌল নাসিকার ছায়ায় অধরের উপরে শিশির-বিন্দুর মত ঐ যে ঢল্-ঢলে ঘামের ফোঁটাগুলি, ডানদিকের ফুলের মত রাঙা নধর কপোলে ঐ যে একটি ছোট কালো তিল,—ও-গুলি দেখিলে মনের ভিতর দিয়া যেন কিসের একটা প্রাণ-পাগল-করা ঝড় বহিয়া যায়!

নলিনী অত মনোযোগ দিয়া অবাক্ হইয়া কি দেখিতেছে? অমিয় একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিয়া লইল। ছবিখানি

সে আগেই দেখিয়াছিল ; সুতরাং নলিনীর এই মনোযোগের কারণ বুঝিতে তাহার দেরি হইল না।

সে বলিল, "বাস্তবিক নলিনি, আমাদের দেশে বিধবাদের যে দুঃখ, তা ভাব্‌লেও প্রাণ কেঁদে ওঠে।"

নলিনী লজ্জিতভাবে তাড়াতাড়ি মাসিক-পত্রখানা মুড়িয়া বলিল, "ভগবানের দণ্ড যারা মাথা পেতে নিতে জানে না, তাদের দুঃখ কে ঘোচাবে বলুন? পৃথিবীর দুঃখকে সহ্য কর্‌তে পারা, তাকে অস্বীকার কর্‌তে পারা, যে একটা মহা গৌরবের কাজ, এ কথা কি আপনি মানেন না অমিয়বাবু?"

অমিয় নলিনীর মুখ হইতে এরূপ উত্তরের প্রত্যাশা করে নাই। সে খানিক চুপ করিয়া রহিল ; তারপর বলিল, "কিন্তু ততটা মনের জোর, ততটা সহ্য কর্‌বার শক্তি এই দুর্ব্বল পৃথিবীতে ক-জনের আছে?"

নলিনী, মুখ না তুলিয়াই তেমনইভাবে বলিল, "হ্যাঁ, যারা সহ্য কর্‌তে পারে না, যারা মনুষ্যত্বকে কলঙ্কিত কর্‌তে পারে, তাদের জন্য সমাজ একটা উপায় স্থির করুক্।"

"কি উপায়, বল।"

"ধরুন, বিধবা-বিবাহ।"

"এতে তোমার মত আছে?"

"আমার মত নেই ; কারণ, মানুষের এমন শোচনীয়

অবস্থা, আত্মার এমন অধঃপতন আমি কল্পনাও কর্‌তে পারি না; তবে এইটুকু বল্‌তে পারি যে, যারা দুঃখ বলে' স্বীকার করে না, যারা বৈধব্যকে ব্রত বলে, পূর্ব্বজন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলে' গ্রহণ করে, তাদের যিনি বিবাহ দিতে চান, তিনি মহা অধর্ম্ম করেন। আপনিও কি তাই বলেন না, অমিয়বাবু?"

অমিয় সোজাসুজি কোন জবাব না দিয়া বলিল, "দেখ, বিধবাদের বিবাহ দিলে, দেশ থেকে অনেক গুপ্ত পাপের বীজ নষ্ট হয়ে যায়।"

নলিনী মুখ রক্তবর্ণ করিয়া বলিল, "দেখুন অমিয়বাবু, কম পাওয়া যায় বলেই জগতে ভাল জিনিষের আদর বেশী। সবাই সীতা-সাবিত্রী হলে, কবিরা আর বিশেষ করে সীতা-সাবিত্রীর কাহিনী রচনা কর্‌তেন না। বিধবাদের ভিতরেও হয় ত সকলে মনের মধ্য থেকে বল পান না, হয় ত কারুর কারুর পদস্খলন হয়, হয় ত এমনই দুর্ব্বলা বিধবার সংখ্যাই বেশী দেখা যায়। আমার ত মনে হয়, প্রকৃত বিধবার দেবীত্বও এইখানে; কিন্তু আদর্শ বিধবা অল্প বলে, আপনি সকলকার উপরে এক আইন জারি করে আদর্শের অপমান কর্‌তে পারেন না। কেমন, পারেন কি?"

অমিয় মৃদুস্বরে বলিল, "না, তা পারি না।"

নলিনী বলিল, "আদর্শ বিধবা দুঃখকে দুঃখ বলে স্বীকার

করেন না? আপনারা যাকে দুঃখ বলে মনে কর্‌চেন, বিধবা হয় ত তাকে ব্রত বলে, কর্ত্তব্য বলে, অগ্নি-পরীক্ষা বলে হাসিমুখে সব সহ্য করে থাকেন। আপনি বল্‌বেন, এ-রকম দুঃখ-কষ্ট সওয়া মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। আমি বলি, স্বাভাবিক নয়, তাই বিধবার গৌরব। ইন্দ্রিয়-সংযম করে লোকে যে সন্ন্যাস-ব্রত নেয়, বৈধব্য-ব্রতের চেয়ে তাতে কি কম কঠোরতা? নিশ্চয়ই নয়। বিধবাদের বৈধব্য-ব্রত পালন কর্‌তে হয় বলে আপনাদের যখন কান্না পায়, তখন সন্ন্যাস-ব্রতের বেলায় আপনারা বিদ্রোহিতা করেন না কেন? আমি ত বলি, সন্ন্যাসব্রতকে যাঁরা সম্মানের চোখে দেখেন, বৈধব্য-ব্রতকেও তাঁহাদের সেইভাবে দেখা উচিত।"

অমিয় বলিল, "এইখানে তুমি মস্ত ভুল কর্‌চ নলিনী! মানুষ সন্ন্যাস-ব্রত নেয়—স্বেচ্ছায় আর অসহায়া রমণীর উপরে বৈধব্য-ব্রত এসে পড়ে—বজ্রাঘাতের মত—তার অনিচ্ছাকে অগ্রাহ্য করে। যাতে ইচ্ছা নেই, তাকে কি সহ্য করা চলে?"

নলিনী বলিল, "কেন চল্‌বে না? গোড়া থেকে আমরা যদি তেমন শিক্ষা পাই, এই দুঃখের পৃথিবীতে সকল রকম দুঃখের জন্য সর্ব্বদাই যদি আমরা প্রস্তুত থাক্‌তে পারি, সর্ব্বত্রই আমরা যদি ভগবানের মঙ্গল হস্ত, কর্ম্মফলের পরিণাম দেখ্‌তে পারি, তা হলে আর দুঃখ কি, দুঃখ কোথায়? যারা এমন

শিক্ষা পায় নি, সংসারে ইন্দ্রিয়ই যাদের কাছে বড়, তারা আপনাদের বিধানমত চল্‌তে চায়, চলুক্‌ অমিয়বাবু! কিন্তু এক কাঠগড়ায় সকলকে পুরে বিধবার অপমান কর্‌বেন না, কর্‌বেন না।”

নলিনী, অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া এতক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া অমিয়ের দিকে চাহিল; দেখিল, অমিয়ের নিষ্পলক মুগ্ধনেত্র তাহার মুখের উপরে চিত্রের মত স্থির হইয়া আছে। সে দৃষ্টিতে নলিনী তর্কের কোন ভাব পাইল না—যাহা পাইল, তাহাতে সে চকিত, ভীত ও স্তব্ধ হইয়া গেল;—আর, একি! দাদা কোথায়?

রমেশ তাহাকে এখানে একেলা রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে, আর সে এতক্ষণ ধরিয়া অমিয়বাবুর সঙ্গে নিজে বিধবা হইয়াও বিধবা-বিবাহ লইয়া তর্ক করিতেছে! নলিনী বুঝিল, রমেশের চলিয়া যাওয়ার কোন গূঢ় অর্থ আছে। কি অর্থ? নলিনী একেবারে বোবা হইয়া আবার মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

কেহ কোন কথা কহিল না,—এমনই অনেকক্ষণ গেল। অমিয় একদৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল, তর্কের তাপে নলিনীর কপোলে যে গোলাপী আভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, এখন কেমন করিয়া সে রংটুকু অল্পে অল্পে মিলাইয়া যাইতেছে!

নলিনী বলিল, "আমি এখন আসি অমিয়বাবু!"

অমিয় একটু দুঃখিতভাবে বলিল, "তোমার দাদা চলে গেছেন বলে, তোমারও পলাবার কোন দরকার নেই। আমি নরমাংসপ্রিয় রাক্ষস নই, মানুষকে ভক্ষণ করা আমার অভ্যাস নয়।"

নলিনী উঠিতে-উঠিতে অপ্রস্তুত হইয়া আবার বসিয়া পড়িল।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া অমিয় বলিল, "নলিনি, ভাল করে শোন, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

কথা! এই কথাটার ভয়েই নলিনী যে এখান হইতে পলাইয়া বাঁচিতে চায়! সে কোন জবাব দিল না, চেয়ারের উপরে জড়-সড় হইয়া বসিয়া বসিয়া ঘামিতে লাগিল।

চেয়ারখানা সরাইয়া নলিনীর আর একটু কাছে সরিয়া আসিয়া অমিয় বলিল, "তোমার পিতা, আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতে চান, একথা তুমি নিশ্চয়ই জান!"

নলিনী মুখ তুলিতে গিয়া পারিল না। সে কাপড়-চোপড়গুলো ভাল করিয়া গায়ের উপরে টানিরা দিয়া আড়ষ্ট হইয়া রহিল।

অমিয় তাহার সুমুখে হেঁট হইয়া বলিল, "এ বিবাহে

আমার দিক্ থেকে কোন আপত্তি নেই; কিন্তু বিবাহের আগে তোমার মত জানাটা দরকার মনে করি।

নলিনী মৃদু, অস্পষ্ট, কম্পিতস্বরে থামিয়া থামিয়া বলিল, "কি জান্‌তে চান?"—তাহার পর ঘন ঘন শ্বাস পড়িতে লাগিল।

অমিয় একবার চোখ তুলিয়া দেখিল, নলিনীর পাত্‌লা পাত্‌লা ননির মত নরম ঠোঁট দুখানি নড়িয়া নড়িয়া উঠিতেছে আর ফাঁকে ফাঁকে কর্পূরের মত ধব্‌-ধবে, মুক্তার মত সার-গাঁথা দাঁতগুলি দেখা যাইতেছে। সে মিনতিপূর্ণ কোমলস্বরে বলিল, "তুমি আমাকে বিবাহ কর্‌বে কি না, আমি তাই জান্‌তে চাই নলিনি! মনে রেখ, তোমার একটি 'না' কি 'হাঁ'র উপরে আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ, সমস্ত সুখ-দুঃখ, সমস্ত আশা-ভরসা নির্ভর কর্‌চে। চুপ্ ক'রে থেক না—বল, বল, বল!"—অমিয় হঠাৎ আবেগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া, দুই হাতে নলিনীর দুই হাত চাপিয়া ধরিল।

নলিনীর মুখ একেবারে মড়ার মত শাদা হইয়া গেল এবং প্রথমটা সে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার বুক একবার উঠিতে ও একবার নামিতে লাগিল,—হৃদয়ের ভিতরে তার বন্দী-প্রাণ তখন যেন গভীর যন্ত্রণায় ছট্‌-ফট্‌ করিতেছিল! কিন্তু তাহার পরেই চকিতে আপনার হাত টানিয়া লইয়া উচ্চ, তীব্র ভর্ৎসনার স্বরে নলিনী বলিল, "অমিয়বাবু!"

অমিয় মূঢ়ের মত চাহিয়া দেখিল, নলিনীর কুপিত নয়ন যেন বাজের মত আগুনভরা!

নলিনী দাঁড়াইয়া উঠিয়া ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "অমিয়বাবু! জানেন, আমি বিধবা! আপনি আমাকে অপমান কর্‌তে সাহস করেন?"

অপরাধীর মত মাথা নীচু করিয়া জড়িতস্বরে অমিয় বলিল, "আমাকে মাপ্ কর নলিনি! আমি তোমাকে অপমান কর্‌তে যাই নি।"

নলিনী নীরবে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

অমিয় সকাতরে বলিল, "যেওনা নলিনি! আমার কথার একটা উত্তরও দিয়ে যাও।"

"আপনি আমার গায়ে হাত দিয়ে উত্তর চান্! আপনার যা জিজ্ঞাসা কর্‌বার আছে, বাবাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বেন—আমাকে নয়!"

না দাঁড়াইয়া, পিছনপানে না তাকাইয়া, এই কথা বলিতে বলিতে নলিনী রাজ্ঞী-মহিমায় বিদ্যুতের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেকেলে ঠাকুরমা

সাঁঝের সময়ে ঠাকুর-ঘরে সন্ধ্যা দিয়া, ঠাকুরমা দরজার চৌকাঠের পাশটিতে বসিয়া হরিনামের মালা ফিরাইতে ছিলেন।

নলিনী আসিয়া ধন্না দিয়া পড়িল, "ঠাকুরমা, আজ একবার তোমার দিদিমার সহমরণের গল্প বল।"

হরিনামের ঝুলিটি তিনবার কপালে ছুঁয়াইয়া ঠাকুরমা বলিলেন, "যে পাপ সংসারে এসে পড়েচি, এখানে সে সব পুণ্যের কথা বল্‌তে আমার মন সরে না বাছা!"

নলিনী ঠাকুরমার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল, "যেখানে পাপ, সেইখানেই ত পুণ্যের কথা বল্‌তে হয় ঠাকুরমা!"

ঠাকুরমা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তবে শোন্ বাছা!"

হরিনামের ঝুলিটি দেয়ালে একটি পেরেকে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া ঠাকুরমা আরম্ভ করিলেন, "দাদাবাবু যখন বিদেশে মারা পড়েন, আমরা তখন জন্মাই নি। মারা যাবার আগে দাদাবাবু, দিদিমাকে আন্‌বার জন্যে ছেলেকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এদিকে রাতে কু-স্বপন দেখে দিদিমা সারা সকালটা কারুর সঙ্গে কথা-বার্ত্তা কন নি। ছেলে যখন কাঁদো-কাঁদো মুখে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করলে, তখন কিছু বল্‌বার আগেই দিদিমা বল্‌লেন, 'বুঝেচি বাবা, আমার পোড়াকপাল পুড়েচে। চল, এখুনি আমি তোমার সঙ্গে যাব।'—ছেলের সঙ্গে দিদিমা দাদাবাবুর কাছে গিয়ে দেখেন, সব শেষ। দেখে তিনি

কাঁদ্‌লেনও না, একফোঁটা চোখের জলও ফেল্‌লেন না। খালি বল্লেন, তোমরা সব যোগাড়-যন্ত্র কর, আমি সহমরণে যাব।' তাই শুনে, সেখানে আত্মীয় স্বজন যাঁরা যাঁরা ছিলেন, সবাই মিলে দিদিমাকে হাতে-পায়ে ধরে মানা কর্‌তে' লাগ্‌ল। দিদিমা প্রথমে কারুর কোন কথায় জবাব দিলেন না। শেষটা বিরক্ত হয়ে বল্‌লেন, 'তোমরা আর আমায় জ্বালার উপরে জ্বালা দিও না। আমি ওঁর সঙ্গে না গেলে, স্বর্গে গিয়েও উনি শান্তি পাবেন না।'—এ-কথার ওপরে কেউ আর কোন কথা কইতে পার্‌লে না। দিদিমা নতুন লালপেড়ে-শাড়ী পর্‌লেন, এক-গা গয়না পর্‌লেন, ভাল করে মাথায় জল্‌-জলে সিঁদুর, পায়ে টক্‌-টকে আল্‌তা পর্‌লেন; স্বামীর সঙ্গে স্বর্গে যাবেন, মুখে হাসি আর ধরে না! চারিদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেল, রাজ্যের যে যেখানে ছিল, সবাই শ্মশানের ওপরে ভেঙ্গে পড়ে দো-সারি কাতার দিয়ে দাঁড়াল, সবাই ধন্যি-ধন্যি কর্‌তে লাগ্‌ল; কেউ এসে পায়ের ধুলো নেয়, এয়োরা এসে দিদিমার মাথার সিঁদুর চেয়ে নেয়, ঢুলিরা ঢাক-ঢোল বাজাতে সুরু কর্‌লে, চন্দন-কাঠের চিতায় ঘড়া ঘড়া ঘি ঢালা হ'ল, ধূপ-ধুনো জ্বেলে দেওয়া হ'ল,—আহা, কে বল্‌বে সে শ্মশান, যেন রাজ-অট্টালিকা! দিদিমার মুখে কথা নেই, কিন্তু হাসি আছে,—হাস্‌তে হাস্‌তেই তিনি শ্মশানে এসেছিলেন, হাস্‌তে হাস্‌তেই

চিতায় গিয়ে উঠ্‌লেন, হাস্‌তে হাস্‌তেই স্বামীর পায়ে প্রণাম করে', তাঁর পাশে গিয়ে শুলেন। ধু-ধু করে আগুন জ্বলে' উঠ্‌ল —কিন্তু দিদিমা একটুও নড়্‌লেন না, একটুও শব্দ কর্‌লেন না —তিনি সতীত্বের জোরে ডঙ্কা মেরে হাস্‌তে-হাস্‌তেই স্বর্গে স্বামীর সেবা কর্‌তে চলে গেলেন। চারিদিক্ থেকে এয়োরা সব প্রণাম করে বল্‌তে লাগ্‌ল, 'এমন মরণ যেন জন্মে জন্মে মরি' !"

বলিতে বলিতে চোখের জলে ঠাকুরমার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল,—সেই পবিত্র, স্বর্গীয় দৃশ্য তাঁহার চোখের সাম্‌নে যেন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, সন্ধ্যার আধ-অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া বসিয়া তিনি যেন তাহাই দেখিতে লাগিলেন! অবশেষে হঠাৎ তিনি নলিনীর দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া আবার বলিলেন, "কি বংশের রক্ত তোর গায়ে আছে, একবার ভেবে দেখ্ দেখি বাছা! তোর কি হবে নলি, তোর কি হবে!

নলিনীও কাতরস্বরে ঠাকুরমার কথার প্রতিধ্বনির মত বলিল, "আমার কি হবে ঠাকুরমা, আমার কি হবে !"

ঠাকুরমা দুঃখের সহিত বলিলেন, "তুই ত এ-বাড়ীর মত নস্ নলি! তবে বিধাতাপুরুষ তোর কপালে এমন কলঙ্কের কালি মাখিয়ে দিচ্চেন কেন?"

নলিনী সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, "না ঠাকুরমা, না! কলঙ্কের কালি যে মাখে সে মাখুক্, আমি মাখ্‌ব না—কখ্‌খনো না, কখ্‌খনো না!"

ঠাকুরমা নলিনীর চোখের উপরে স্থির দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "তাই হোক্ বাছা, তাই হোক্! দেখ্ মা নলি, তুই আমার বুকের নিধি—দেবতা ছাড়া তোর মত আর কাউকে আমি এত ভালবাসি না; তোর পায়ে কাঁটা ফুট্‌লে মনে হয়, সে আমার প্রাণে বিঁধ্‌ল! কিন্তু আজ যদি তুই মরে' যাস্, তা হলে আমার মত সুখী আর কেউ হয় না, আর কেউ হয় না!"

নলিনী ঠাকুরমার বুকের ভিতরে মুখ লুকাইয়া, দুই হাতে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে বলিল, "সত্যি ঠাকুরমা, আমি যদি মরি, তুমি তা হলে কাঁদ না—তুমি হাস?"

ঠাকুরমা নলিনীর গালে সস্নেহে চুমা খাইয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "হ্যাঁ মা, কলঙ্কের চেয়ে বিধবার মৃত্যু ভাল!"

নলিনী ঘুমাইতে গেল

ঘরের দেওয়ালে তাহার স্বামীর একখানি 'ফটো' টাঙ্গান আছে, নলিনী অপলক ঊর্দ্ধনেত্রে সেই চিত্রের দিকে তাকাইয়া, দাঁড়াইয়াছিল। ছবির মূর্ত্তির মুখে সেই সরল, মধুর হাসি,—যে হাসি দেখিয়া একদিন সে বিশ্বের সমস্ত ভুলিয়া যাইত।

নলিনী ছবিখানি দেওয়াল হইতে নামাইয়া প্রাণপণে আপন বুকের উপরে চাপিয়া ধরিল,—এত জোরে যে—কাঁচখানা 'ফ্রেম' হইতে ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া ঘরের মেঝেতে ছড়াইয়া পড়িল ; কিন্তু সেদিকে নলিনী ভ্রূক্ষেপও করিল না,—দুই চক্ষু বুজিয়া গভীর শান্তিতে যেন সে অনেকদিন পরে আবার হারিয়ে-যাওয়া দুখানি বাহুর নিবিড় আলিঙ্গনের ফিরিয়ে পাওয়া স্পর্শ সুখ অনুভব করিতে লাগিল।

নলিনীর মনে পড়িল, বিবাহের কিছুদিন পরে স্বামীর সঙ্গে একদিন তার তর্ক বাধিয়াছিল যে, আগে কে মরিবে ?

তাহার স্বামী বলিয়াছিলেন, "দেখ', তোমার আগে আমি যাব, আমাকে তুমি ফাঁকি দিতে পার্‌বে না।"

নলিনী, স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া জোরের সহিত বলিয়াছিল, "আমি যদি সতী হই, তবে আমি তোমাকে রেখে যাবই-যাব!"

তার সে জোর আজ কোথায় ? যে সতীত্বের বড়াই সে করিয়াছিল, আজ যে তাতেও কলঙ্কের ছাপ্‌ পড়িবার যো হইয়াছে! তিনি যখন গিয়াছেন, শূন্য প্রাণের মায়া তখনও সে ছাড়িতে পারে নাই; আর আজ, কলঙ্কের আশঙ্কার ভিতরেও সে এই অন্ধকার, নিঃসঙ্গ জীবনকে এখনও আঁকড়াইয়া ধরিয়া বাঁচিয়া আছে,—হা রে ছার মায়া !

নিঝুম রাতে ঘরের চির-জাগন্ত ঘড়ীটা অশ্রান্তভাবে আওয়াজ করিতেছিল,—টিক্, টিক্, টিক্। নলিনীর বোধ হইল, ঘড়ী যেন টিট্‌কারি দিয়া তাহাকে বলিতেছে,—ধিক্, ধিক্, ধিক্!

আস্তে আস্তে সে বাক্সটা খুলিল। ভিতরে লাল রেশমী সূতায়-বাঁধা একতাড়া কাগজ,—সেগুলি তার স্বামীর চিঠি! নলিনী বাঁধন খুলিয়া এক একখানি করিয়া চিঠিগুলি পড়িতে লাগিল,—আর সঙ্গে সঙ্গে অতীত যেন জীবন্ত হইয়া তাহার প্রাণের লুকানো ঘরটি ভরিয়া তুলিল। এই চিঠিগুলির প্রত্যেকখানি কত আশার, কত অপেক্ষার, কত পথ চাওয়ার পর ডাক-পিয়নের 'ব্যাগ' হইতে তাহার হাতে আসিয়া পড়িত! এগুলি পড়িতে পড়িতে প্রেমের সোহাগে কতদিন সে না কাঁদিয়া থাকিতে পারিত না,—কোন কোন চিঠির হরফে এখনও সেই শুষ্ক অশ্রুর দাগ লাগিয়া রহিয়াছে। পত্রপাঠ করিতে করিতে অশ্রুজলে আজও তাহার চোখ ছাপিয়া উঠিল;—কিন্তু সে ছিল আনন্দের অশ্রু; আর এযে আজ নিরানন্দের নয়ন-ধারা!

নলিনী ঘরের সাম্‌নের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল।

উপরে ঘুমন্ত নীলিমা—সুমুখে চঞ্চল গঙ্গা। আকাশ উপ-ছাইয়া চাঁদের আলো পৃথিবীতে ঝরিয়া যেন মৌন গীতিময়ী

স্বপ্নপুরী রচনা করিতেছে ; গঙ্গাজলে তরঙ্গদল দীপালি-উৎসবে মত্ত হইয়া কলহাস্যে নৃত্য করিয়া তীরে তীরে টলিয়া পড়িতেছে !

দূরের কোন্ নৌকা হইতে দখিনা বাতাস এক মেঠো সুর বহিয়া আনিল—

"যা রে কোকিলা তুই
আমার প্রাণপতি গেছে যে দেশে,—
শুনে তোর কুহুস্বর
উষ্‌কে ওঠে পরাণ আমার,
প্রাণপতি মোর গেছে গাঙের পার—
(ও তুই) ছাড়্‌গে তথা কুহুস্বর—"

কিন্তু, পোড়া কোকিল তবু থামিল না ; কোথায় লুকাইয়া সে অবোধ আপন মনে যেমন ডাকিতেছিল, তেমনই ডাকিতে লাগিল, কুহু কুহু কুহু ।

আর একদিন অমনই কোকিল ডাকিয়াছিল । নলিনীর প্রাণ-পটে স্মৃতি কবেকার এক ছবি আঁকিয়া দিল । এমনই এক পূর্ণিমার রাতে, এমনই দলমলে জ্যোৎস্নায়, এমনই ঝল্‌মলে গঙ্গাজলে স্বামীর সঙ্গে বোটে করিয়া, তীর ছাড়িয়া সে কতদূর চলিয়া গিয়াছিল । তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া, নলিনী চাঁদকে দেখিতে দেখিতে, ঢেউএর হাসি, হাওয়ার গান শুনিতে

শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—তারপর স্বামীর আদর-ভরা চুম্বনে আবার সে জাগিয়া উঠিয়াছিল।

নলিনী আজ আবার ঘুমাইবে। হাঁ, মনকে শক্ত করিয়া অনেকক্ষণ থেকে সে প্রস্তুত হইয়া আছে। আর দেরি নয়।

স্বামীর ছবি বুকে চাপিয়া, নলিনী পা টিপিয়া টিপিয়া অতি সন্তর্পণে নীচে নামিয়া গেল।

এই ত গঙ্গার ঘাট! কোনদিকে কোন সাড়া শব্দ নাই—স্বধু গঙ্গাজলে মৃদু মৃদু ঢেউএর বীণায় রহিয়া রহিয়া জ্যোৎস্না-রাগিণী বাড়িয়া উঠিতেছে।

রাত্রি যেন স্তব্ধ হইয়া নেত্রহীন নেত্র মেলিয়া নলিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আছে!

নলিনী ঘাটের সোপান দিয়া নামিতে লাগিল,—ধীরে, ধীরে, ধীরে। মৃত্যু ঘুমে তাহার আত্মা আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। এই নিরালা জগতে, এই ফুটু-ফুটে চাঁদের আলোকে, এই সঙ্গীতময়ী রজনীতে স্বামীর ছবি বুকে করিয়া এবার ঘুমাইবে, সে ঘুমাইবে!

ডাকাত

ক

পাশের বাড়ীতে বিয়ে; কিন্তু গয়না সব স্যাকৃরার বাড়ীতে—গয়না নহিলে মেয়েদের নেমন্তন্ন রাখা হইবে না। গয়নাগুলো রং করিতে দেওয়া হইয়াছে—হুকুম পাইলাম, সেগুলো যেমন করিয়া হোক্ আজকেই ফিরাইয়া আনা চাই-ই-চাই!

স্যাকৃরার দোকানে হাজির হইয়া গয়নাগুলো চাহিলাম। সে হাতযোড় করিয়া বলিল, "বসুন বাবু, অ্যাদ্দূর থেকে এলেন, একটু তামুক ইচ্ছে করুন।"

আমি হচ্ছি স্যাকৃরার একজন মস্ত খদ্দের। বুঝিলাম, সে আমাকে কিঞ্চিৎ আপ্যায়িত না করিয়া অমনি-অমনি ছাড়িবে না। অতএব, বসিলাম।

স্যাকৃরার দোকানগুলিকে অনায়াসে সরকারি বৈঠকখানা বলিতে পারা যায়। তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে এখানে সকালে-বিকালে পাড়ার যত সত্যমিথ্যা গুজব, নিন্দা, কুৎসা ও ঘোঁট পাকাইয়া উঠিতে থাকে।

তামাকের মিঠে-কড়া ধোঁয়ায় বেড়ে মস্‌গুল হইয়া উঠিয়াছি, এমন সময় একটা আধ্‌বুড়ো লোক হাঁপাইতে হাঁপাইতে দোকানে ঢুকিয়া বলিল, "ওহে শুনেছ !"

স্যাকরা বলিল, "কি ?"

নেশার আরামে তখন আমার চোখদুটি স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। ধূম্রকুণ্ডলীর ফাঁক দিয়া সেই অবস্থায় দেখিলাম, আগন্তুকের মুখ-চোখ গল্প বলিবার আগ্রহে ও উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। খবরটা নিশ্চয় যে-সে খবর নয়—শুনিবার জন্য কান খাড়া করিয়া রহিলাম।

"মুখুয্যেদের বাড়ীতে মস্ত ডাকাতি হয়ে গেছে যে !"

—"কখন্ মশাই, কখন্ ?"

—"এইমাত্র। পাড়ায় থাকো—পাড়ার কোন খবর রাখ না—কি-রকম লোক হে !"

—"এঁজ্ঞে, একটা গোলমাল শুন্‌ছিলুম বটে। কিন্তু নিজেদের দোকান ফেলে ত আর পরের বাড়ীর ডাকাতি দেখতে যেতে পারি না মশয়, আমার দোকান দেখে কে ?"

—"হুঃ, দোকান দেখা ! চোখে-কানে এরা দেখতে-শুনতে দিচ্ছেনা হে বাপু—এরা সেই হাওয়া-গাড়ীর বাবু-ডাকাত, হাতে এদের ইয়া ইয়া পিস্তল ! লোকের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর রাখে ! এই দ্যাখনা, মুখুয্যেদের জমিদারী থেকে

আজ অনেক টাকা এসেছিল, এরা ঠিক সে সন্ধান পেয়ে দেউড়ীতে এসে হাজির! পিস্তলের একটি আওয়াজ শুনেই যত সব পাঁড়ে-দোবে-চোবের দল রাধা-কিষণকে টিকির মধ্যে লুকিয়ে ভোঁ-দৌড়, ডাকাতদের চেহারা দেখেই মুখুয্যে-মশাই ভির্‌মি খেয়ে চিৎপটাং, ডাকাত-বাবুরা সোজা এসে বুক ফুলিয়ে সোজাই চলে গেল, যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে গেল জমিদারীর সমস্ত টাকার তোড়া, মেয়েদের সমস্ত গয়না!"

—"অ্যাঁ—বলেন কি, বলেন কি! তারপর?"

—"তারপর—কাল শুনো সব। খবরটা টাট্‌কা থাক্‌তে থাক্‌তে সবাইকে আগে শুনিয়ে আসি"—লোকটা যেমন হঠাৎ আবির্ভূত হইয়াছিল, তেমনি হঠাৎ অন্তর্হিত হইল।

এতক্ষণে আমার স্তিমিত নেত্র আশ্চর্য্যরূপে বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছে।

স্যাক্‌রা আমার পানে ফিরিয়া বলিল, "মশয়, শুনলেন!"

"হুঁ।"—বলিয়া হুঁকায় একটি সুখ-টান্ মারিতে গিয়া দেখিলাম, বহুক্ষণ চুম্বন-অভাবে অভিমানিনী হুক্কাসুন্দরীর প্রেম-বহ্নি নিবিয়া গিয়াছে। হুকাটি স্যাক্‌রার হাতে দিয়া বলিলাম, "তাইত, এখন উপায়?"

স্যাক্‌রা দোকানে কুলুপ লাগাইতে লাগাইতে বলিল, "আমি ত মশয়, বাসায় চল্লুম!"

—"তাঁ তো দেখ্‌তেই পাচ্ছি। কিন্তু আমি কি করব? সঙ্গে এতগুলো গয়না, যেতেও হবে অনেকটা।"

—"আসি মশয়, নমস্কার!"—আমার কথার কোন জবাব না দিয়া, স্যাক্‌রার পো ভয়ে ভয়ে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে চট্‌পট্ চম্পট দিল।

খানিকক্ষণ হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিলাম। শীতের রাত্রি; কুয়াশা আর অন্ধকারে চারিদিক ঝাপ্‌সা।

খ

গয়নাগুলো পেট-কাপড়ে বাঁধিয়া, উঠিলাম। এদিকে ওদিকে চাহিয়া—লোকজন বড় নজরে ঠেকিল না—ডাকাতের ভয়ে যে যার বাড়ীতে ঢুকিয়া দরজার খিল আঁটিয়াছে।

বলির পাঁঠার মত কাঁপিতে কাঁপিতে প্রাণটি হস্তগত করিয়া পথ চলিতে লাগিলাম! আমার বাড়ী শ্যামবাজার, এখান থেকে দেড় মাইলেরও বেশী। প্রত্যেক গলি-ঘুঁজির মুখ দিয়া যাই, আর বুকটা দুদ্দুড়্ করিয়া উঠে! মনে হয়, ঐ অন্ধকারে, আনাচে কানাচে নিশ্চয়ই কোন একটা বদ্‌খত্ চেহারা পিস্তল বাগাইয়া লুকাইয়া আছে—দিল বুঝি মাথার খুলি উড়াইয়া! সেই লোকটার কথা মনে হইল, 'এরা লোকের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর রাখে!'—ও বাবা, আমার কাছে গয়না আছে এরা কি সেটা টের পাইয়াছে? তা আর পায় নাই—

যার যা কাজ! এ-সব খবর না রাখিলে কি এদের ব্যবসা চলে? চারিদিকেই এদের চর ঘুরিতেছে—তাদের চোখে ধুলা দেওয়া সহজ নয়। যে লোকটা ডাকাতির খবর দিয়া গেল সেই যে চর নয় তাই-বা কে বলিতে পারে! তারপর হঠাৎ মনে পড়িল, স্যাকৃরার কাছ থেকে গয়নাগুলো লইয়া আমি যখন কাপড়ে বাঁধিতেছিলাম, তখন রাস্তা দিয়া একটা চোয়াড়ে চেহারার লোক কট্‌মট্ করিয়া আমার দিকে চাহিতে চাহিতে গিয়াছিল। নিশ্চয় সে ডাকাতের চর! এতক্ষণ সে তার দলকে কি আর খবর দেয়-নি যে, আমার কাছে একরাশ গয়না আছে!

রাস্তায় মাঝে মাঝে লোকজন চলিতেছে, তাদের সকলকেই ডাকাত বলিয়া সন্দেহ হইতে লাগিল। চুপা যাই—আর চম্‌কিয়া উঠি। হঠাৎ দেখি, একখানা মোটর-গাড়ী দুই চোখে অগ্নিবর্ষণ করিতে করিতে আমার দিকেই ছুটিয়া আসিতেছে। গাড়ীতে অনেকগুলো লোক! যতক্ষণ না গাড়ীখানা আমাকে পার হইয়া চলিয়া গেল, ততক্ষণ আমি একটা বাড়ীর রোয়াকে উঠিয়া গা ঢাকা দিয়া দুরু-দুরু প্রাণে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

বড় রাস্তায় আসিয়া প্রাণটা তবু কতকটা ধাতস্থ হইল। এখানে এত ভিড়, পুলিসের এমন কড়া পাহারা,—ডাকাতের

দল এ রকম জায়গায় নিশ্চয়ই কারুর গলা টিপিয়া ধরিতে পারিবে না!

শ্যামবাজারের দিকে যতই আগাইতেছি, রাস্তার ভিড় ততই পাতলা হইয়া আসিতেছে—আর আমার ভয় ততই চরমে উঠিতেছে। তবে, ভরসা এই যে, আর মিনিটদশেক মা-কালীর ইচ্ছায় ভালয় ভালয় কাটিয়া গেলেই বাড়ী পৌঁছিতে পারিব।

হঠাৎ আমাদের পড়্‌শী রামবাবুর সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "এত তাড়াতাড়ি ঝোড়ো কাকের মত কোথেকে হে?"

—"স্যাক্‌রার বাড়ীতে গিয়েছিলুম রাম দা!"

—"কেন?"

চুপি চুপি বলিলাম, "গয়না আন্‌তে।"

—"দিন-কাল ভাল নয়—খুব সাবধান।"

—বলিয়া, তিনি যেদিকে যাইতেছিলেন, সেইদিকেই চলিয়া গেলেন।

খানিক আগাইয়া একবার পিছনে ফিরিলাম। কিছু তফাতে আর একজন লোক! একটু তাড়াতাড়ি পা চালাইয়া দিলাম।

গ

রাত্রিকালে শ্যামবাজারের রাস্তায় একেই লোকজন কম চলে, তাহাতে এখন আবার শীতকাল। চারিদিক নিসাড়। আমার পায়ের জুতা ঠুকিয়া 'ফুটপাথে' বেজায় খট্‌খট্ শব্দ হইতেছিল। কিন্তু, সেই সঙ্গে, পিছনে আর একজনেরও পায়ের শব্দ পাইতে লাগিলাম। আবার ফিরিয়া দেখি, সেই লোকটা তখনও আমার পিছনে পিছনে আসিতেছে। গ্যাসের আলোয় যতটা বোঝা গেল,—লোকটা খুব ঢেঙ্গা, মোটাসোটা, ষণ্ডা, একরকম গুণ্ডা বলিলেই হয়। তার হাতেও একগাছা ছড়ি,—না, তাকে শীর্ণ সংস্করণের বংশযষ্টি বলাই যুক্তিসঙ্গত—কেননা, সে রকম লাঠি হাতে থাকিলে কোঁচানো কোঁচা ঝোলানো এবং অভাগার মাথা ফাটানো—এই দ্বিবিধ কার্য্যই সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে।

এ ডাকাত টাকাত নয় ত—আমার পিছু নেয় নাই ত? পরখ করিবার জন্য একটা পানওয়ালার দোকানের সুমুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। অকারণে এক পয়সার পান কিনিলাম। পিছনের লোকটাও রাস্তার উপরে দাঁড়াইয়া পড়িল। পান কিনিয়া আমি অগ্রসর হইলাম, সেও অমনি চলিতে সুরু করিল। আমি একটা গলির ভিতর ঢুকিলাম, সেও সঙ্গে সঙ্গে ঢুকিল।

না—কোন সন্দেহ নাই, এ আমারই পাছু লইয়াছে।

মনে হইল, স্যাক্‌রার দোকানে আমার দিকে যে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া গিয়াছিল, এ নিশ্চয় সেই লোক না হইয়া আর যায় না! আমার বাড়ী দেখিয়া গিয়া দলের লোককে খবর দিবে, তারপর সকলে মিলিয়া আমার বাড়ী লুঠিয়া টাকা ও গয়না সব লইয়া যাইবে।

আমার বুক ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করিতে লাগিল;—এখন উপায়? ইহাকে কিছুতেই আমার বাড়ী দেখানো হইবে না। সেখানে গিয়া যদি গুলি টুলি চালায়, তাহা হইলে এক সঙ্গে ধনে প্রাণে মজিব এবং মরিব।

চলিতে চলিতে হঠাৎ ডানদিকের একটা সরু গলিতে ঢুকিয়া পড়িলাম। তারপর অপথ বিপথ কুপথ—এমন কি আঁস্তাকুড় মাড়াইয়াও, অন্ধকারে হাত্‌ড়াইতে হাত্‌ড়াইতে, হোঁচট খাইতে খাইতে, মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে যেখানে গিয়া নাক ঘষিয়া গেল, সেখানে আমার মাথার চাইতেও উঁচু এক পাঁচিল! সেখানে আলোও নাই—পথও নাই। তাইত, কি করি? কোনদিকেই যে সুরাহা নাই! যেদিকেই তাকাই, চোখে খালি সর্ষে ফুল দেখি! খানিক ভাবিয়া স্থির করিলাম, যা থাকে কপালে—পাঁচিল ত টপ্‌কাই, ওপারে হয়ত রাস্তা আছে। নহিলে, যে পথে আসিয়াছি সে পথে আবার যদি ফিরি—নাঃ, ফেরার কথা ভাবিবামাত্র বুকটা ধড়াস্‌ করিয়া

উঠিল! আমি তার চোখে ধূলা দিবার ফিকিরে আছি দেখিয়া ডাকাত নিশ্চয়ই বেজায় খাপ্পা হইয়া আছে। বিঘোরে প্রাণ খোয়ানোর চেয়ে পাঁচিল টপ্‌কানো ঢের ভাল অথচ সহজ।

দিলাম এক লাফ! তারপর ওপাশে নামিতে না নামিতে, যুগপৎ হৃদয় এবং শ্রবণ ভেদী চীৎকার আকাশ এবং পৃথিবী কম্পিত—প্রকম্পিত করিয়া ও আমাকে স্তম্ভিত করিয়া দিল—"ওরে বাবারে—চোর চোর, খুন করলে—খুন!"

সেই অহেতুক, অন্যায় ও অভদ্র চীৎকার আমাকে একেবারে পাথরের মত অচল করিয়া দিল বটে, কিন্তু, অচল হইলেও চলিতে হইবে—কি করি? ঐ যে দুম্‌দাম করিয়া জানালা দরজা খুলিয়া গেল না? ও বাবা, ওরা কারা—কেউ লাঠি হাতে, কেউ আলো হাতে, কেউ বঁটি-হাতে—এ যে জলন্ত উনুন ছাড়িয়া ফুটন্ত তেলে আসিয়া পড়িলাম! আমার সংবর্দ্ধনার জন্যই কি এই বিপুল আয়োজন? না মহাশয়গণ, আপনারা আমাকে ভুল বুঝিয়াছেন, এরূপ সশস্ত্র অভ্যর্থনায় আমি একেবারেই অভ্যস্ত নই, অতএব—

—দিলাম আর এক লাফ,—যে পথে আসিয়াছি সেই পথে ফিরিতে!

কিন্তু লোকগুলো বিষম চালাক এবং চট্‌পটে। আমি

নিরাপদ-ব্যবধানে যাইতে-না-যাইতেই ওদের একজন খপ্ করিয়া আমার একখানা পা যত-জোরে পারে ধরিয়া ফেলিল।

আমি কিন্তু ততোধিক চালাক! ইঁদুরের মত জাঁতিকলে পড়িয়াই আমার মাথা খুলিয়া গেল! কৃত্রিম যন্ত্রণায় কাত্রাইয়া উঠিলাম—"ছাড় বন্ধু, ছাড়, পা ছাড় হে! পায়ে ফোঁড়া—উঃ, উঃ!"

ফোঁড়ায় হাত পড়িলেই হাত সরাইয়া লইতে হয়—এ হচ্ছে সংস্কার! যে আমার পা ধরিয়াছিল, তাহার বজ্রমুষ্টি চকিতে আল্গা হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমিও—সর্পমুখচ্যুত ভেকের মত—ঝুপ্ করিয়া অন্ধকারে খসিয়া পড়িলাম।

যে আমাকে এমন বাগাইয়া পাক্ড়াও করিয়াছিল, আমাকে ছাড়িয়া দিয়াই হতাশভাবে পাঁচিলের ওপাশ হইতে সে বলিয়া উঠিল—"ঐ যাঃ!"—অর্থাৎ, তার মনে পড়িয়া গিয়াছে যে, সাধুর পায়ে ফোঁড়া হইলেই ছাড়িয়া দিতে হয় আর চোরের পায়ে যত বড়ই ফোঁড়া হোক্ না কেন, সে পা আরও জোরে চাপিয়া ধরা কর্ত্তব্য!

পা উঁচু এবং মাথা নীচু করিয়া অন্ধকারে যে কোথায় ঠিক্রাইয়া পড়িলাম—ভগবান জানেন কিন্তু আমার মনে হইল যেন, ধড়ের উপর হইতে আমার মাথাটির অস্তিত্ব একেবারেই

বিলুপ্ত হইয়াছে! খড়িয়াই উঠিলাম—কেননা, মাথা থাক্ আর যাক্—পা যখন আছে, তখন এ-সময়ে বন্ বন্ বেগে সেই পদ-যুগল ব্যবহার করা ছাড়া মুক্তিলাভের 'নান্যঃ পন্থা'! এবার ধরিলে আর কিছুতেই বাঁচিব না—আগে প্রহার, পরে কারাগার! আমার এ ডাকাতের গল্প শুনিবে কে?

উঠিলাম এবং—বলাবাহুল্য—ঘোড় দৌড়ের ঘোড়ার মতই ছুটিলাম, এখানে সেখানে দুচারবার ধাক্কা খাইয়াও ছুটিলাম, ইটে লাগিয়া দুবার হোঁচট ও একবার ডিগবাজী খাইয়াও ছুটিলাম, কাছা খুলিয়া ও একপাটি জুতা হারাইয়াও ছুটিলাম,—একেবারে গলির মোড়ে গিয়া থামিলাম—কারণ, থামিতে হইল।

—গলির মুখ জুড়িয়া দাঁড়াইয়া আছে সেই বিপুলবপু—ডাকাত!

আমাকে দেখিয়াই সে হুঙ্কার করিয়া উঠিল—"এই যে—পেয়েছি!"

আমি একদম থ! দুর্গানাম জপিতে জপিতে ভাবিলাম, কার খপ্পরে পড়া উচিত? যে আমার ঠ্যাং ধরিয়াছিল, তার হাতে,—না, উপস্থিত যে আমার সুমুখে মূর্ত্তিমান্, তার হাতে? একদিকে দমাদ্দম্ বেদম প্রহার, ও অন্ধকার কারাগার—আর একদিকে মুহূর্ত্তে সংহার—ডাঙ্গায় বাঘ ও জলে কুমীর—শ্রেয়

কি? চালাক মন বলিল, পুনর্ব্বার মধ্যপথের যাত্রী হও—শ্রেয় হচ্ছে, পলায়ন (পার যদি)।

কোন রকম পূর্ব্বাভাস না দিয়া আচম্‌কা ভয়ানক চেঁচাইয়া উঠিলাম—"কে তুমি?" তেমন জোরে জীবনে আর কখনো চেঁচাই নাই।

ডাকাত বিনামেঘে এমন বেয়াড়া বজ্রনাদের আশা একেবারেই করে নাই—সে চম্‌কাইল, ভড়কাইল, পিছনে হঠিল। সেই ফাঁকে পাশ কাটাইয়া পুনর্ব্বার আমার প্রাণপণ পলায়ন!

আমার প্রাণ পলায়নের দিকে নিবিষ্ট থাকিলেও, কাণ ছিল ঠিক ডাকাতের দিকেই। দ্রুত পদশব্দে বুঝিলাম, সেও ছুটিতেছে। ভাগ্যলক্ষ্মী বুঝি এইবার আমার পক্ষ ত্যাগ করিলেন।

মোড় ফিরিতেই দেখি, সামনে মস্ত এক গাছ। পণ্ডিত-কথিত আমাদের পূর্ব্বপুরুষের অভ্যাস এখনও ভুলি নাই; সুতরাং একটুও ইতস্ততঃ না করিয়া চট্‌পট্‌ গাছের উপরে উঠিয়া গেলাম।

ও রাস্তায় বহু কণ্ঠে বিচিত্র ধ্বনি উঠিল, "ধর্‌ বেটাকে!" "মার্‌, মার্‌!" "পুলিশ, পুলিশ!" কিছুক্ষণ এমনি হট্টগোল চলিলল তারপর সব চুপচাপ।

প্রথমটা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তারপর মনে পড়িল,

যারা আমার চরণ ধারণ করিয়াছিল, চোর ধরিবার আশা নিশ্চয়ই তারা ত্যাগ করে নাই। আমাকে না পাইয়া, ধাবমান ডাকাতকে দেখিয়া, চোর সন্দেহে নিশ্চয়ই তারা সে গোঁয়ারটাকেই পাকড়াও করিয়াছে! গাছের টঙ্গে বসিয়া ঘণ্টাখানেক ধরিয়া তেত্রিশ কোটিকে গড়্ করিতে লাগিলাম। তারপর নামিলাম।

হে মা কালী, এ যাত্রা প্রাণে প্রাণে ভারি বাঁচাইয়া দিয়াছ; আমি অকৃতজ্ঞ নই মা, কালিঘাটে কাল তোমার নামে এবং আমার পয়সায় জোড়া পাঁঠা পড়িবে।

ঘ

পাশের বাড়ীতে মেয়েদের নেমন্তন্নে যাইতে একটু রাত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তারা নেমন্তন্নে গিয়াছিল এবং গয়না পরিয়াই। গয়না আনিতে এত দেরি হইল বলিয়া গিন্নীর নথ প্রথমটা কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু আমার ইতিহাস শুনিয়া—মুখনাড়া ত দূরের কথা—অচিরে তাঁকে নথনাড়াও বন্ধ করিতে হইল। তিনি আমার গায়ে-মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে মেয়েলি অভিধান হইতে এমন কতকগুলো সুনির্ব্বাচিত শক্ত শক্ত বিশেষণ ডাকাতদের সপ্তগোষ্ঠীর উপরে প্রয়োগ করিলেন, যাহা শুনিলে যে-কোন ভদ্র দস্যু কাণে হাত দিয়া লজ্জায় এবং অপমানে মাথা হেঁট

করিতে বাধ্য হইত! সেইরাত্রেই গৃহিণীর মুখে আমার অপূর্ব্ব বিপদ এবং অপূর্ব্বতর উদ্ধারলাভের কাহিনী পল্লবিত ও অতিরঞ্জিত হইয়া পাড়াময় রটিয়া গেল।

পরদিন সকালে বসিয়া বসিয়া গত রাত্রির ব্যাপারখানা ভাবিতেছি, এমন সময় বাহিরে আমার নাম ধরিয়া কে ডাকিল। গলাটা অচেনা।

নীচে নামিয়া আসিলাম। কিন্তু সদর দরজায় গিয়া যে ডাকিতেছে, তাহাকে দেখিয়াই আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া ও মাথা ঘুরিয়া গেল! এ যে সেই,—ডাকাত! এখানে কেন? প্রতিশোধ নিতে?

ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পায়ে পায়ে বাড়ীর ভিতরদিকে পিছাইতে লাগিলাম।

ডাকাত হাত তুলিয়া আদেশ দিল, "দাঁড়ান!"

হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া পড়িলাম।

"আমার পিঠ্‌টা আগে দেখুন"—বলিয়া সে জামা তুলিয়া গম্ভীরবদনে আপনার পৃষ্ঠদেশ আমাকে দেখাইল। সমস্ত পিঠটা যুড়িয়া লম্বা, গোল নানা আকৃতির কালশিরা পড়িয়াছে, কত ঘা লাঠি, জুতা ও ঘুষি খাইলে মানুষের পিঠের দশা অমনধারা সাংঘাতিক হইতে পারে, সেটা অনুমান করা অসাধ্য।

ডাকাত চোখ পাকাইয়া বলিল, "আমার এ দশা কার জন্যে, বলুন দেখি ?"

কিছু বলিলাম না—আমার কাঁপুনি ক্রমেই বাড়িয়া চলিল।

ডাকাত আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিয়া কঠোর স্বরে বলিল, "আপনার জন্যে—বুঝেছেন, আপনার জন্যে।"

আমি বোবা বনিয়া ঘাড় হেঁট করিলাম।

ডাকাত বলিল, "পাড়ায় যা রটিয়েছেন, তা আমি শুনেছি। তাই শুনেই বুঝে নিয়েছি, আপনি কে!—জানেন মশাই, কাল আমায় গারদে রাত্রিবাস করতে হয়েছিল ? জানেন মশাই, কতকষ্টে আমি খালাস পেয়েছি ? জানেন মশাই, হাজতে কত বড় বড় মশা আছে ? জানেন মশাই, কাল সারারাত সজাগ থেকে হাজার মশার সঙ্গে আমায় একা লড়্‌তে হয়েছে ?"—ডাকাত ক্রমে আমার কাছে আসিয়া, আমার মুখের কাছে মুখ আনিয়া উচ্চস্বরে বলিল, "আর জানেন কি—আমি কে ?"

মনে মনে বলিলাম, "বলা বাহুল্য।"

ডাকাত বলিল, "একজন গোবেচারী বরযাত্রী। আপনার পাশের বাড়ীতে নেমন্তন্নে আসছিলুম। থাকি দূর পাড়াগাঁয়ে।

ট্রেণ ফেল্ করাতে ঠিক সময়ে বরযাত্রীর দলে মিশ্‌তে পারিনি। কনের বাড়ী চিনি না—পথের লোককে জিজ্ঞেস করে করে আসছিলুম। একটি বুড়ো ভদ্রলোক আপনাকে দেখিয়ে দিয়ে বল্লেন, 'ওঁর বাড়ী কনের বাড়ীর পাশে—ওঁর পিছু পিছু যান।' (ভদ্রলোকটিকে রাম-দাদা বলিয়া আন্দাজ করিলাম) তাই আসছিলুম মশায়ের পেছনে পেছনে।"

নিজের কাণকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না—যা শুনিতেছি, এ কি সত্য? বেকুব বনিয়া বাধো বাধো গলায় বলিলাম, "আপনি—আপনি কি ডা!"

হো হো করিয়া হাসিয়া সে বলিল, "আমি কেন—আমার চতুর্দ্দশ পুরুষের মধ্যে কেউ ডাকাত হয়নি। আপনি ভেবেছিলেন আমি ডাকাত। যারা আমায় হাজতে পাঠিয়েছিল, তারা ভেবেছিল আমি চোর কি খুনে। কিন্তু কেউ ভাবলে না যে, আমি নিরীহ বরযাত্রী-মাত্র। আজ সকালে যখন বিয়েবাড়ীতে এসে হাজির হলুম, তখন মশায়ের 'অপূর্ব্ব উদ্ধারলাভে'র গল্প শুনে নিজের দুঃখে কাঁদব কি, হাস্‌তে হাস্‌তে পেটের নাড়ী ছিঁড়ে যাবার যোগাড়। অঁ্যা! এ যে একেবারে আস্ত উপন্যাস!"

অশ্রু

ক

আমাদের বাড়ী পাশাপাশি। উপমাদের সঙ্গে আমাদের বেশ একটু ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তার যোগ ছিল। উপমার সঙ্গে ছেলেবেলায় কত খেলাই খেলেছি—যদিও সে আমার চেয়ে বছর-পাঁচেক বয়সে ছোট। সুতরাং, বাল্যের ভালবাসা যে যৌবনের প্রেমে পরিণত হবে, এ-আর আশ্চর্য্য কি?

উপমার বাবা সুরেনবাবু নব্যতন্ত্রের হিন্দু। মেয়ের বিয়ের জন্য তাঁর স্ত্রী যথেষ্ট মুখরা হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই স্বামীর 'মাথার টনক্' নড়াতে পারেন-নি। মেয়ে বড় হবে, লেখাপড়া শিখ্‌বে, তবেই বিয়ের কথা—এই ছিল তাঁর পণ।

প্রথম যেদিন তার কাছে আত্মপ্রকাশ করি, সে দিন সে কিছুই বলে-নি; কিন্তু তার প্রসন্ন নতদৃষ্টি ও রক্ত কপোলে হৃদয়ের মৌন সম্মতি পেয়েছিলাম। বাগানের গোলাপগাছ থেকে একটি আধ-ফোটা ফুল তুলে তার এলো খোঁপায় গুঁজে দিলাম—আমার প্রাণের পুলকই ফুলের পাপ্‌ড়িগুলিকে যেন

রঙ্গিন করে তুলেছিল। উপমা আমার একখানি হাত দুহাতে নিজের মুঠোর ভিতর নিয়ে কোলে করে বসে রইল। আমরা কেউ কিছু বল্লাম না—বকুলশাখার কানে-কানে বাতাস মৃদু গুঞ্জনে যে কথা বল্ছিল, সারাসন্ধ্যা সেইখানে বসে বসে আমরা তাই শুধু শুন্তে লাগ্লুম।

খ

এ-কথা কত লুকানো!

জান্তাম, আমার আইন-পড়া সাঙ্গ না হলে বাবা কখনই এ বিবাহে মত দেবেন না। বিশেষ সে সময়ে আমার বাবা ফিটের ব্যামোয় বড় কষ্ট পাচ্ছিলেন। সুতরাং তখনকার মত আমার প্রাণের কথা, আমার প্রাণেই চাপা রইল।

রোজ সন্ধ্যাবেলায় আমি উপমাদের বাড়ীতে চা খেতে যাই—এটি আমার অনেক দিনের অভ্যাস।

সেদিনও নিয়মমত গেলাম।

টেবিলের একধারে বসে সুরেনবাবু খবরের কাগজ পড়ছিলেন। আমি তাঁর সামনে গিয়ে বস্লুম। উপমা চকিত চোখে একবার আমার দিকে তাকিয়ে, একটু হেসে চায়ের পেয়ালায় দুধ ঢাল্তে লাগ্ল। উপমার চোখের এই দৃষ্টিতে এখন আমি এক নূতন ভাষা দেখি—চারিদিকে লোক জন

থাক্‌লেও সে ভাষা আমি ছাড়া আর কেউ পড়্‌তে পার্‌ত না—সে ভাষা যে কেবল আমারই জন্য !

বাইরে পায়ের শব্দ হোল। সুরেনবাবু খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে বল্লেন, "উপা, বোধ হয় নরেন আস্‌ছে।"

নরেন উপমার দাদা।

নরেন ঘরের ভিতরে এল—তার পিছনে সাহেবী পোষাক-পরা আর একজন লোক। হঠাৎ এক অচেনা লোক দেখে উপমা একটু জড়সড় হয়ে আমার কাছে ঘেঁসে দাঁড়াল।

নরেন বল্লে, "উপা, লজ্জা করিস্‌নে, এ আমার বন্ধু অজিত। বাবা, আমার মুখে অজিতের কথা শুনেছেন ত ?"

সুরেনবাবু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন, "এস বাবা, এস ! নরেনের বন্ধু বলে তোমাকে আর আপনি বল্লুম না। বোসো—ঐ চেয়ারে বোসো। উপা, আর দু-পেয়ালা চা তৈরি কর্‌ত মা !

অজিত হেসে বল্‌লে, "কোর্টের ফের্‌তা আস্‌ছি, নরেন আর আমাকে বাড়ী গিয়ে খোলস্ ছাড়্‌বার অবকাশ দেয়-নি। আশা করি দাঁড়কাকের এ ময়ুরপুচ্ছকে আপনারা সকলে ক্ষমা কর্‌বেন।" টুপী হাতে করে অজিত আমার সামনের চেয়ারে বসে পড়্‌ল।

এই অজিতের কথা আজ ক-দিন ধরেই শুন্‌ছি। অজিত,

খুব বড়লোকের এক মাত্র সন্তান। কল্‌কাতায় বি-এ পাশ করে বিলাতে গিয়ে সে ব্যারিষ্টার হয়ে এসেছে। দেখ্‌তেও সে বেশ সুপুরুষ। নরেন কাল বল্‌ছিল, অজিতের সঙ্গে উপমার বিয়ে হলে বেশ হয়। কথাটা তীরের ফলার মত আমার বুকে গিয়ে বিঁধেছিল বটে,—কিন্তু ভেবেছিলুম সে শুধু কথার কথা।

আজ আমার চায়ের পেয়ালায় কে যেন নিম-পাতার রস ঢেলে দিয়েছে! কোন রকমে চা পান কর্‌তে কর্‌তে ভাবতে লাগলুম, নরেন যখন অজিতকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, ব্যাপারটা তখন আর হাল্‌কা ভেবে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। উপমা যে এখন আমার দেহের সঙ্গে রক্তের মত মিশে আছে,—সে পরের হবে, এ যে ভাবতেও পারি না। উপমাকে এখন যেদিন ভুল্‌ব—সেদিন আমি নিজেকেও হয়ত ভুলে যাব।

ভাবছি, হঠাৎ আমার বেয়ারা ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলে, বাবার আবার ফিট হয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লুম।

গ

বাবার এবারকার পীড়া কিছু গুরুতর! ডাক্তার বল্লেন, কলকাতার গরম বাবার সহ্য হচ্ছে না, এঁকে দু-একদিনের মধ্যেই দার্জ্জিলিঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত, নইলে অবস্থা হঠাৎ খারাপ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

মা ধরে বস্‌লেন, কাল্‌কেই দার্জ্জিলিঙ্গ যাব। স্থির হোল দার্জ্জিলিঙ্গে আমার এক মামা আছেন, আপাতত সেইখানে গিয়েই উঠ্‌ব।

বল্‌তে-কি, এ সময়ে আমার মন কলকাতা থেকে কিছুতেই নড়্‌তে চাইছিল না, কিন্তু উপায় নেই—এ যে কর্ত্তব্য!

সকালে উঠে তাড়াতাড়ি উপমাদের বাড়ী ছুটলাম।

ঢুক্‌তেই দেখি, উপমা বাগানে দাঁড়িয়ে ফুল তুল্‌ছে।

আমি তার কাছে গিয়ে বল্‌লাম, "উপা, বাবার ব্যামোর বড় বাড়াবাড়ি—তাঁকে নিয়ে আমরা দার্জ্জিলিঙ্গ যাচ্ছি।"

"কবে, প্রভাত-দা?"

"আজই।"

"—আজই! সেকি, যাবার আগে মা-বাবা দেখতে পাবেন না?"

"কেন উপা, তোমার বাবা আর মা কোথায়?"

"তাঁরা শ্রীরামপুরে কাকার বাড়ী গেছেন। কাল আস্‌বেন।"

আমি হতাশভাবে বল্‌লাম, "তোমার বাবার সঙ্গে আজ আমার দেখা হওয়ার যে বড় দরকার ছিল উপা!"

"কেন প্রভাত-দা?"

"—আমার হাতে তোমাকে দিতে তাঁর কোন আপত্তি আছে কিনা, যাবার আগে সেকথা জেনে যেতাম !"

উপমার গালদুটি রাঙ্গা হয়ে উঠ্‌ল। ঘাড় হেঁট করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে বল্লে, "তোমরা চলে যাচ্ছ, এইবেলা আমি সকলকার সঙ্গে দেখা করে আসি।"

নরম কাঁধের উপর এলানো চুল দুলিয়ে উপমা চলে যেতে উদ্যত হোল,—আমি আবেগভরে তার সুমুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে গাঢ়স্বরে বল্‌লাম, "দাঁড়াও উপমা, অনেক দিন তোমায় দেখ্‌ব না, একবার ভাল করে দেখে নি !"

উপমা একবার চকিতের জন্য পূর্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল,—পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে লজ্জায় নুয়ে ফুলের ডালার দিকে চেয়ে থম্‌কে দাঁড়াল !

গাছের ফাঁক দিয়ে সোণার মত এক ঝলক রোদ্ এসে উপমার মুখের একদিকটি আলোয় আলো করে তুল্‌ল—সে মূর্ত্তি যেন গ্রীক ভাস্করের উপাস্য প্রতিমা !

ঘ

দার্জ্জিলিঙ্গে এসে বাবার রোগ কম্‌ল না—কিন্তু নানান্ উপসর্গ বাড়তে লাগ্‌ল।

আমাদের মনের আনন্দই প্রকৃতিতে প্রাণসঞ্চার করে।—সে আনন্দ আমার ছিল না। তাই উপত্যকায় মেঘের মেলা,

তুষার-পটে আলোর খেলা, শৈল-কোলে ঝরণার লীলা—এ সব চোখ দিয়ে দেখ্‌তাম মাত্র, মন দিয়ে গ্রহণ কর্‌তে পার্‌তাম না ;—সবই যেন অর্থহীন চিত্রের মত !

সুধু বাবার অসুখই এত অশান্তির কারণ নয় ; নিয়তি সকল দিক থেকেই আমাকে কাবু কর্‌বার ফিকিরে আছে।

জীবনের এই ভাগটা শিশুর পক্ষে দ্বিতীয় ভাগের মত আমাকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে, —একে বাদ দেওয়াও চলে না, মনে রাখাও কষ্টকর। এ দুর্দ্দিনের কথা ভুলে যেতে কত না চেষ্টা করেছি,—কিন্তু পারি নি, কিছুতেই পারি নি! এ যেন আগুনের আখরের মত আমার বুকের ভিতরটা দাগী করে রেখেছে !

——তাকে দেবী বলেই জানতাম। না,—জানতাম কেন, এখনো তাই বলেই জানি, তাই বলেই পূজা করি। ভ্রম-প্রমাদের জীবনে হয়ত সে ক্ষণিকের ভুল করে ফেলেছিল। কিন্তু কার অভিশাপে ক্ষণিকের সে ভুল আমার অদৃষ্টে চিরস্থায়ী হয়ে রইল ?

দার্জ্জিলিঙ্গে আসবার পরে, কল্‌কাতা থেকে প্রথম চিঠি পাই উপমার। আমরা কে কেমন আছি জিজ্ঞাসা করে সব শেষ লাইনে সে লিখেছিল :—"প্রভাত দাদা, তোমার জন্যে আমার মন কেমন করে।"

সর্ব্বশেষের সামান্য এই একটি লাইনকে তোমরা কেউ অসামান্য বলে ভাববে না হয়ত। আমি কিন্তু সেই লাইনটিকে ইষ্টমন্ত্রের মত মনে মনে কতবার—কতদিন যে জপ করেছি, তা আর বলা যায় না। প্রেমে যে সামান্যকে অসামান্য করে তোলে!

আজও সে লাইন—সেই একটিমাত্র লাইন আমার জীবনকে মন্ত্রমুগ্ধ কোরে রেখেছে। "প্রভাত দাদা, তোমার জন্যে আমার মন কেমন করে।"—উপমার শেষ পত্রের এই শেষ পংক্তিটি স্মরণীয়। কারণ, তারপর উপমার জীবনে যেদিন এসেছে, সে-দিনের কথা আর আমার অধিকারে নেই—সে তখন অন্যের ধর্ম্মপত্নী!

চিঠি লেখবার সময় সত্যই কি তার মন কেমন করেছিল? এখনো মাঝে মাঝে কথাটা ভাবি। একটা ইতর প্রাণীর সঙ্গে থাক্‌লেও যে তার উপরে মায়া পড়ে,—আর আমি হচ্ছি তার বাল্যসাথী,—কত কাল থেকে একসঙ্গে আছি,—আমার উপরে কি তার মায়া পড়ে নি? এ আর বিচিত্র কি? কিন্তু আমার এ প্রাণ ত তার মায়ার কাঙ্গাল ছিল না—সে যে চেয়েছিল, প্রেম! উপমাও ত তা জান্‌ত!

আবার, আর এক হতেও পারে। হয়ত, আমার জীবন তার নির্দ্দয়তায় নিস্ফল হয়ে যাবে বলে, আমার হতভাগ্যের

কথা ভেবে তার মনে অনুতাপের ক্ষণিক দয়া হয়েছিল। তাই কি? উপমার এ মন কেমন করা কি প্রথম শিকারীর করুণার মত? না, না,—আর ভাব্‌তে পারি-নি। এযে নিজের দেহেই ছুরি চালিয়ে শব ব্যবচ্ছেদ শিক্ষা হচ্ছে। এ ব্যাপার যতই বিশ্লেষণ কর্‌ব, আমার আত্মা ততই রক্তাক্ত হয়ে উঠ্‌বে!

ধনীর সন্তান অজিতের অর্থের মোহেই হোক্, আর তার বাপ মার ইচ্ছা বা আদেশেই হোক্,—উপমা যখন আমাকে ত্যাগ করেছে, তখন আর কারণ চিন্তা করে লাভ কি? অকালে, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে গেলেও চাতক যখন বাদলের ধারা পাবে না, তখন তার পক্ষে কান্না-থামানোই হচ্ছে, উচিতকার্য্য।

* * * *

উপমার চিঠি সামনে রেখে সেদিনও মেঘের প্রাসাদ তৈরি কর্‌ছিলাম, এমন সময়ে সুরেনবাবুর এক পত্র এসে আমার সুখের মেঘে আগুণ ধরিয়ে দিলে। সেই পত্রেই প্রথম জানলুম, অজিতের সঙ্গে উপমার বিবাহ।

আমার তখনকার মনের অবস্থা ভাষায় বর্ণনা করা নিষ্ফল; কারণ, সে ত আমি পার্‌ব না! কল্পনায় পরের মানস-ভাব হয়ত ফুটানো যায়, কিন্তু নিজে যা প্রাণে প্রাণে অনুভব কর্‌ছি, সে কঠিন বাস্তবকে ভাষায় ঠিক প্রকাশ করা

যায় কিনা, তাতে আমার সন্দেহ আছে। অন্তত আমার সে শক্তি নেই।

জীবনে ধিক্কার এল,—নারীর প্রতি ঘৃণা হোল। সারা সন্ধ্যা কেমন যেন আচ্ছন্নের মত চুপ করে বসে রইলুম,—যখন সাড় হোল তখন রাত্রি হয়েছে।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি,—আমার বুক ছাপিয়ে অনন্ত কালিমা যেন বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। চন্দ্রশূন্য আকাশ, মাথার উপরে যেন এক কালিমাখা বিরাট কটাহের মত উল্টে রয়েছে। আমার মনে হতে লাগল, পৃথিবীতে শত শত অভাগার প্রাণে প্রাণে অহরহ যে দুঃখের চিতা জল্‌ছে, তারই শিখার ধূমে আকাশ অত অন্ধকার!

উপমার চিঠিখানা হাতেই ছিল,—সেখানা বাতির আলোয় ধর্‌লুম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কিন্তু ছাই হয়েও চিঠিখানা একেবারে গুঁড়ো হয়ে গেল না,—বেঁকে চুরে দুম্‌ড়ে গেল মাত্র। মাথা হেঁট করে তার দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম। ছোট ছোট চেনা হাতের লেখায় তখনো পড়া যাচ্ছে, 'প্রভাত-দাদা, তোমার জন্যে আমার মন কেমন করে!'—করে নাকি? করুক্! বিদ্রূপের স্বরে আপন মনে হেসে উঠে, পত্র ভস্ম সবলে মুঠোয় চেপে ধর্‌লুম, মুড়্ মুড়্ করে একটা শব্দ হোল—সে যেন কার অতি মৃদু

আর্ত্তনাদ! যখন মুঠো খুল্‌লুম, হঠাৎ একটা দম্‌কা হাওয়া এসে ছাইগুলোকে এক ঝাপ্‌টায় নিঃশেষে উড়িয়ে নিয়ে গেল।

*　　*　　*　　*

মনের যখন এমনি অবস্থা, বাবার অসুখ তখন চরমে উঠ্‌ল।

সুরেন বাবুর আর এক পত্র পেলুন,—উপমার বিয়ের নিমন্ত্রণ! তার দু-চারদিন পরেই বাবাকে নিয়ে কল্‌কাতায় রওনা হলুম।

মনে আছে, উপমাদের বাড়ীতে যেদিন সানায়ে সাহানা বাজচে, আমাদের বাড়ীতে সেদিন কান্নার রোল উঠেছে!

৬

কল্‌কাতা আমার বিষ হয়ে উঠেছিল। ওকালতী পাশ করেই তাই পশ্চিমে চলে এসেছি। ছোট ভায়ের সঙ্গে মা কল্‌কাতাতেই আছেন।

বছর-দুই কেটে গেছে। এর মধ্যে মনের উন্নতি যত-না হোক্,—আর্থিক উন্নতি কিছু-কিছু হয়েছে।

মা প্রতি পত্রেই কান্না ধরেছেন, এইবার আমাকে বিয়ে করতে হবে। কিন্তু সে-কথা আমি কানে তুলিনি।

ইতিমধ্যে মার চিঠিতে উপমার খবরও পেয়েছি। তার জীবন সুখের নয়। অজিত মাতাল আর লম্পট। উপমার গায়ে হাত তুল্‌তেও সে পিছপাও নয়।

নিয়তি !

আমার কথা কি আর তার মনে আছে ? বোধ হয়, না। নইলে, বিয়ের পর থেকে সে আমার কোন খোঁজখবর নেয়-নি কেন ? ভাল স্বামী না পেলেও সে টাকা ত পেয়েছে বটে ! উপমা এখন বিলাসিনী ধনীর ঘরণী। সেখানে আমি কে ?

থাক্ ও কথা। অতীতের চিতাভস্ম কুড়িয়ে, কি আর হবে ?

এদিকে মা হতাশ হয়ে উঠ্ছেন। শেষপত্রে তিনি লিখেছেন, যাদের নিয়ে এ-বয়সে তাঁর সংসার ধর্ম্ম, তারা যদি সংসারী না-হয়, তবে তিনিও আর সংসারের ভার বইবেন না—কাশী চলে যাবেন।—চিঠির ঝাপসা কালি দেখে বুঝলাম, লিখ্তে লিখ্তে মা কেঁদেছেন। মনে কেমন একটা ঘা লাগ্ল।—অভাগিনী বিধবা জননী আমার ! না ভেবে-চিন্তেই উত্তর দিলাম—আমি বিয়ে কর্‌ব।

চ

দেশে ফির্‌ছি।

একেলে বিয়ের বাজারে রোজগারী উকীল-বর ভারি আক্রা—একরাশ পুঁটিমাছের ভিতরে দশ-সেরী একটি কাত্লার মত। সুতরাং, আমাকে কেন্‌বার খরিদ্দারের অভাব হয়-নি।

মত দিয়েছি বলে এখন অনুতাপ হচ্ছে। পরিচিতকে যে আপন করতে পারলে না, অপরিচিতকে সে কি আর আপন করতে পারবে ?

ট্রেণ একটা বড় জংশনে এসে দাঁড়াল। কল্‌কাতা থেকেও একখানা যাত্রী-গাড়ী এসে ষ্টেশনে দাঁড়িয়েছিল।

এখন বড়দিনের ছুটি। পশ্চিমে, কল্‌কাতার গাড়ীতে এ-সময় অনেক চেনা মুখ নজরে পড়ে। ও-গাড়ীতে কোন আত্মীয়-বন্ধু আছেন কিনা দেখবার জন্যে কামরা থেকে নেমে পড়্‌লুম।

চেনা মুখ আছে বৈকি ! দু-চার পা যেতে-না-যেতেই যাকে দেখলুম,—তাকে দেখবার আশা মোটেই করি-নি। একখানি সেকেণ্ডক্লাশ রিজার্ভ গাড়ীতে, জানালায় মুখ বাড়িয়ে, ঠিক আমার সামনেই বসে আছে—উপমা !

থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়্‌লুম,—উপমাও আমাকে দেখ্‌তে পেয়েছে !

আমাকে দেখেই সে কেঁপে উঠ্‌ল। তারপর ঘাড় হেঁট করে পাথরের মত বসে রইল। যেন-সে ফাঁশীর হুকুম পেয়েছে !

আমার মনের ভিতর সমস্ত অতীত একচমকে বিদ্যুতের মত খেলে গেল। সেই উপমা !

উঃ, কি বিবর্ণ তার মুখ, কি বিশীর্ণ তার দেহ, কি বিষণ্ণ তার ভাব! সেই রূপে-নিরুপমা উপমা, কেমন করে এমন বিষাদ-প্রতিমা হোল?—এযে জীবন্ত শব!

কতক্ষণ যে অবাক-আড়ষ্ট হয়ে সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, তা আমার মনে নেই। উপমা আমার প্রাণে যে দাগা দিয়েছিল, আমার সমস্তকেই যে ব্যর্থ করে দিয়েছিল, আজ তার এই দীনমূর্ত্তি দেখে সে-সব কথা একেবারে ভুলে গেলাম—ষ্টেশনের সেই ব্যস্ত জনতা, সেই কর্কশ কোলাহল ডুবিয়ে আমার স্মৃতির পটে সেই-একদিনের সোনার ছবি জেগে উঠল, যেদিন তার পাশে বসে, তার হাতে হাত রেখে বকুল-শাখায় বসন্তবাতাসের অশ্রান্ত গানে এক নূতন রাগিনীর আভাস পেয়েছিলাম!

কলকাতার গাড়ীর বাঁশী বেজে উঠল, সে তীক্ষ্ণ ধ্বনি যেন ধারালো অস্ত্রের মত আমার প্রাণটা খান্‌-খান্‌ করে দিলে। আমি চম্‌কে উঠ্‌লুম—উপমাও চম্‌কে উঠ্‌ল।

গাড়ী ছেড়ে দিলে।

উপমা যেন প্রাণপণে চোখ তুলে আমার দিকে চেয়ে রইল,—সে চোখে কোন্ ভাব ছিল, মন তা বুঝেছে, আমার মুখ তা বলতে পারবে-না!

আকাশের রোদ উপমার মুখে এসে পড়্‌ল—তার পাণ্ডুর কপোলে কি ও চক্‌চক্ করছে? অশ্রু!

উপমা কাঁদছে !

কল্‌কাতার টিকিট ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। বিবাহ ? এ-জীবনে নয়।

তার চোখের জলে মনের সকল মলিনতা ধুয়ে গেছে। জীবনে তাকে আর-কখনো দেখি-নি; কিন্তু আমার হৃদয়-মরু সজল করে, আজীবন জেগে থাক্‌বে, সেই এক ফোঁটা অশ্রুজল !

নিয়তি

রাত বারটা।

ঐ পোড়ো-বাড়ীর ভাঙ্গা, কালো প্রাচীরের উপরে আধখানা চাঁদ বাঁকিয়া আছে! চাঁদ কি পাণ্ডুর—যেন মড়ার মুখের মত?—আর, আর—অন্ধকার কি গাঢ়,—যেন মূর্ত্তিমান্ মৃত্যুর মত! ও কিসের ডাক? পেচকের? না অন্ধকারের?

নবীন সে স্তব্ধতা, সে অন্ধকার সহিতে পারিল না—সেদিককার জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া সে আর একদিকে আসিয়া দাঁড়াইল। সেদিককার জানালা খুলিয়া দিতে-না-দিতেই আলোর ঢেউয়ের পর ঢেউ আসিয়া তার ঘর যেন ভাসাইয়া দিল!

সুমুখেই বিবাহ-বাড়ী—উজ্জ্বল আলোয় ঘরে ঘরে হাসি-মাখা মুখ দেখা যাইতেছে। কেহ প্রাণ খুলিয়া হাসিতেছে, কেহ আনন্দের গান গায়িতেছে। চারিদিকে জীবনের লক্ষণ—পৃথিবীতে যেন দুঃখ-বিষাদ বলিয়া কোন কিছু নাই!

নবীনের মনে হইল, সাম্‌নের বাড়ীখানা যেন তাকে আর তার অদৃষ্টকে কঠোর উপহাস করিতেছে;—এর চেয়ে অন্ধকার

যে ঢের ভাল! সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আবার জানালা বন্ধ করিয়া দিল। ঘর আবার অন্ধকার।

সেই অন্ধকারে খানিকক্ষণ সে গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। তারপর আস্তে আস্তে উঠিয়া মাটির প্রদীপটি জ্বালিয়া দিল। প্রদীপে তৈল ছিল খুব অল্প। মিট্‌মিট্ করিয়া কাঁপিয়া দীপ জ্বলিতে লাগিল,—আসন্নমৃত্যু রোগীর মত!

দরিদ্রের ঘর,—চারিদিকে দারিদ্র্যের চিহ্ন! প্রদীপের ম্লান শিখা চারিদিকের দীনতা ও মলিনতা যেন আরও বেশী করিয়া প্রকাশ করিয়া তুলিল!

কতকগুলা ছেঁড়া ন্যাকড়া ও তুলার স্তূপে পরিবারের আর সকলে শুইয়া আছে—একটি রমণী, দুটি ছেলে, তিনটি মেয়ে। তাহাদের দিকে তাকাইয়া নবীন শিহরিয়া উঠিল।

রমণী তাহার স্ত্রী। অভাগীর ঘুমন্ত মুখ হইতেও দুশ্চিন্তার রেখা সরিয়া যায় নাই। তার চোখের কোলে কালি, গালের হাড় উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, আর মুখে যেন হল্‌দে রং মাখান! নবীনের মনে পড়িল, যেদিন উৎসবের বাঁশী ও আনন্দের হাসির মাঝে এই রমণীর সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া পুরোহিত তাহার অদৃষ্টসূত্র বাঁধিয়া দিয়াছিল, সেদিন এই মুখেই, এই নয়নেই, সে কি সুষমা ও কি নবীনতা দেখিতে পাইয়াছিল!

নবীন ঘাড় হেঁট করিয়া ভাবিতে ভাবিতে ঘরের ভিতরে পায়চারি করিতে লাগিল।

আজ তিনমাস হইল, তাহার চাকুরীটি গিয়াছে। সে মাহিনা পাইত কুড়ি টাকা। তাতেই কোনরকমে অর্দ্ধাহারে পেট চলিয়া যাইত।

গেল তিনমাস ধার করিয়া, তৈজস-পত্র বিক্রয় করিয়া কোনক্রমে সে দিন কাটাইয়াছে। সকাল-সন্ধ্যা সে চাকুরীর জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছে; কিন্তু কোথাও চাকুরী পায় নাই। আজকাল পথে বাহির হইলে পাওনাদারেরা তাকে অপমান করে,—ধার চাহিতে গেলে সকলে তাকে তাড়াইয়া দেয়। একখানি ভাড়াঘরে তারা কয়টি প্রাণী মাথা গুঁজিয়া থাকিত; কিন্তু বাড়ীওয়ালা অনেকদিন ভাড়া না পাইয়া আগুন হইয়া আছে। কাল নূতন মাসের ১লা— তাহাদের এ ঘর ছাড়িয়া উঠিয়া যাইতে হইবে।

কিন্তু, কোথায় যাইবে সে? স্ত্রী পুত্রের হাত ধরিয়া পথে দাঁড়া'ন ছাড়া আর ত—কোন উপায় নাই!—আর, খাব কি? পথের ধূলা?

নবীন, দুইহাতে মাথা ধরিয়া বসিয়া পড়িল। ঘরের কোণ হইতে একটা কুকুর এতক্ষণ একদৃষ্টিতে তাহার গতিবিধি দেখিতেছিল। কুকুরটা বুড়া হইয়াছে। সে যখন একমাসের,

নবীন তখন তাকে পথ হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছিল; সেইদিন থেকে সে সুখে-দুঃখে নবীনের পরিবারেরই একজন হইয়া আছে।

নবীনকে বসিয়া পড়িতে দেখিয়া, কুকুরটা আস্তে আস্তে উঠিয়া প্রভুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর আপনার বড় বড় চোখদুটি মেলিয়া নবীনের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। তার পশু-নেত্রে যে দুঃখ ও সমবেদনার ভাব প্রকাশ পাইতেছিল, অনেক সময়ে নর-নেত্রও তেমন গভীর ভাব প্রকাশ করিতে পারে না।

নবীন বলিল, "কি রে ভুলো, তুই যে উঠে এলি বড় ?"

ভুলো ল্যাজ্ নাড়িতে নাড়িতে নবীনের একখানা হাত আদর করিয়া চাটিয়া দিতে লাগিল; সে যেন নবীনকে সান্ত্বনা দিতে চায় !

নবীন তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, ভুলো, যা—আজ্কের রাতটা ঘুমিয়ে নে রে! কাল থেকে তোকেও পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হবে। আহা, এ বুড়োবয়সে এত কষ্ট তুই সইতে পারবি ত ?"

ভুলো, নবীনের মুখের দিকে চাহিয়া একটা অস্ফুট ধ্বনি করিল;—যেন সে সব কথা বুঝিতে পারিয়াছে !

ঘরের ভিতরে হঠাৎ শিশুর কান্নার শব্দ হইল। সে

নবীনের সবচেয়ে ছোট মেয়ে—সবে আজ ছয়মাস পৃথিবীতে আসিয়াছে। নবীন তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাকে কোলে তুলিয়া নিল।

মেয়েটিকে দেখিতে খুব সুন্দর। কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, ড্যাব্‌রা ড্যাব্‌রা চোখ, ফুলো-ফুলো গাল, রাঙা রাঙা ঠোঁট; কিন্তু মরুভূমিতে ফুলের মত, গরীবের ঘরে দিন দিন সে শুকাইয়া যাইতেছে। আজ কয়দিন সে অর্দ্ধাহারক্লিষ্টা জননীর স্তন্যপান করিয়াই কাটাইয়াছে,—অন্য দুগ্ধ তার অদৃষ্টে জুটে নাই।

আলোর দিকে মেয়ের মুখ ফিরাইয়া নবীন খানিকক্ষণ একদৃষ্টিতে শিশুর মুখ নিরীক্ষণ করিল। তারপর খুকির ননীর মতন নরম গালে একটি চুমো খাইয়া বলিল, "খুকি, আর জন্মে তুই কি মহাপাপ করেছিলি যে, এ জন্মে আমার ঘরে জ্বলে পুড়ে মরতে এলি?"

খুকি ঘন ঘন হাত-পা নাড়িতে নাড়িতে হাসিয়া বলিল, "অক্ক, অক্ক, অক্ক!"

নবীন, মেয়েকে নাচাইয়া নাচাইয়া ঘুম পাড়াইল। শেষে, স্ত্রীর বুকের উপরে খুকিকে শোয়াইয়া দিল। সেই স্পর্শে তাহার স্ত্রী জাগিয়া উঠিল! চোখ মেলিয়া, সুমুখেই স্বামীকে দেখিয়া সে ঘুমের ঘোরেই হাত বাড়াইয়া নবীনের গলা

জড়াইয়া ধরিল এবং পাশ ফিরিয়া সেই অবস্থায় আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

নবীন ধীরে ধীরে আপনার গলা হইতে স্ত্রীর হাতখানি নামাইয়া, তার ওষ্ঠে একটি চুম্বন দিয়া আপন মনে বলিল, "ঘুমোও, ঘুমোও—যতটুকু পার ঘুমিয়ে নাও। কাল থেকে ভিখারীদের সঙ্গে ছেলে মেয়ে নিয়ে পথে শুয়ে ঘুমোতে হবে, লোকের কাছে হাত পেতে ভিক্ষে চাইতে হবে! কেউ একমুঠো চাল দেবে, কেউ দূর্-দূর্ করে তাড়িয়ে দেবে। আমার মুখের দিকে ছল ছল চোখে তাকালেও কোন ফল হবে না; কাঁদলেও—কেঁদে কেঁদে মরে গেলেও ভগবান্ মুখ তুলে চাইবেন না।"

টং করিয়া ঘড়ী বাজিয়া উঠিল।

টং! টং!—রাত দুইটা!

নবীন আপন মনে হিসাব করিয়া বলিল, "দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা, ছটা—আর চার ঘণ্টা! ভিখারী সেজে পথে দাঁড়াতে আর চার ঘণ্টা বাকি! আর চার ঘণ্টা আমি ভদ্রলোক আছি! মাগো—[illegible]! আমার মত অভাগাকে তুমি গর্ভে ধরেছিলে কেন? আজ কি আমার কান্না তুমি শুন্‌তে পাচ্ছ না?"—নবীন অশ্রুভরা চোখে স্ত্রীর মুখের উপরে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল।